যে যুবক যুবতীর সাথে ফেরেশতা হাত মিলায়

এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম

যে যুবক যুবতীর সাথে ফেরেশতা হাত মিলায়

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২৭৫

৪র্থ প্রকাশ

রজব	১৪৩০
আষাঢ়	১৪১৬
জুলাই	২০০৯

বিনিময় ঃ ১০০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

JA JUBAK JUBATIR SHATHE FERESHTA HAT MILAY by A. N. M. Sirajul Islam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 100.00 Only.

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হে নওজোয়ান ! হও আগুয়ান

এ বইতে ইসলামে যুবক-যুবতীর দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যুবক-যুবতীরাই মুসলিম উম্মাহর প্রাণশক্তি ও কর্ণধার। তারাই শক্তি, তারাই মুক্তি। তারা বাঘের শক্তি, সিংহের বীরত্ব ও বিদ্যুতের ক্ষিপ্রগতিতে জোর কদমে এগিয়ে চলে এবং মহান প্রতিপালক আল্লাহর নির্দেশে মাঠ-ঘাট আবাদ ও দেশ-মহাদেশ এবং আকাশ-বাতাস জয় করে। কোনো আদর্শের প্রতিপালন, প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ তাদেরই কাজ। সকল জাতির ক্ষেত্রে বিশ্ব ইতিহাস একথারই সাক্ষী।

যুবক-যুবতীসহ সকল নেক বান্দাহর প্রতি আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা নাযিল হয় এবং তাঁরা তাকে নির্ভয় ও জান্নাতের সুসংবাদ দেন। এ মর্মে আল্লাহ কুরআন মজীদে বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ـ

"নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, তারপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা নাযিল হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো।"–সূরা হা-মীম-সাজদা ঃ ৩০

মুসলিম নেক যুবক-যুবতীদের জন্য আল্লাহ বিশেষ ফেরেশতা নিয়োগ করেন, যারা তাদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন, কল্যাণের পথপ্রদর্শন এবং পৃথিবীর সকল কিছু তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেন। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত। এ ফেরেশতারাই তাদের সাথে হাত মিলাতে উদ্যত হন। হযরত হানজালার এক প্রশ্নের জবাবে মহানবী (স) এ মন্তব্য করেন। হাদীসটি বইয়ের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলিম যুবক-যুবতীদেরকে ৪টি মহান কাজ আঞ্জাম দিতে হবে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সংশোধন তাদেরই দায়িত্ব-কর্তব্য। এ দায়িত্বের বিস্তৃতি, পরিসর, তাৎপর্য, গুরুত্ব এবং পদ্ধতিই এ বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের দায়িত্ব সমান ও অভিন্ন। ইসলামের একটি মূলনীতি হল, যা পুরুষের জন্য জরুরী তা নারীর জন্যও জরুরী। কোনো

বিশেষ দলীল-প্রমাণ দ্বারা নারীদেরকে ব্যতিক্রম করা হলে সেটা হবে ভিন্নধর্মী। যেমন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! নারীদের উপর কি জেহাদ ফরয ? তিনি উত্তরে বলেন ঃ তাদের উপর এমন জেহাদ ফরয, যাতে লড়াই নেই। আর তাহলো, হজ্জ ও ওমরাহ।" আরেকটি ব্যতিক্রম হলো, হাদীসে এসেছে, নামাযে পুরুষের ১ম কাতার সর্বোত্তম এবং পেছনে তাদের কাতার সর্বাধিক মন্দ। আর পেছনে মহিলাদের কাতার সর্বোত্তম এবং প্রথমে তাদের কাতার সর্বাধিক মন্দ।

সূরা নূরে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন, সতী নারীদের বিরুদ্ধে অপবাদ দানকারী পুরুষদেরকে ৮০ বেত এবং অনুরূপ কোনো পুরুষের বিরুদ্ধে অপবাদ দানকারিণী মহিলাকেও ৮০ বেত লাগাতে হবে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত সহ অন্যান্য সকল বিষয়ে নারী পুরুষের দায়িত্ব সমান। তাই দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পুরুষের মতই নারীদেরও সমান দায়িত্ব রয়েছে।—তবে, তাদের দায়িত্ব হবে নারী সমাজের মধ্যে এবং নিজ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দাওয়াতী ও প্রশিক্ষণ কাজ এবং জাতি গঠনমূলক কাজ। মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তাদের স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে ব্যাপকহারে ঐ কাজ না করলে সমাজে দীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। মহানবীর আমলে নারীরা তাদের কর্ম ক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি কাজ করেছেন। মা হিসেবে, বোন হিসেবে এবং স্ত্রী হিসেবে তাদের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। কবি বলেন ঃ

বিশ্বের যাকিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

দীনের উপর আমল ও তাকে বিজয়ী করার জন্য প্রয়োজন মনের সিদ্ধান্ত ও সাহস, দৈহিক শক্তি, অপরাজেয় মানসিকতা এবং বুদ্ধি ও প্রতিভার ব্যবহার। নিম্নোক্ত আয়াতই দীন প্রতিষ্ঠার সর্বোত্তম পদ্ধতি ঃ

أُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ
اَحْسَنُ ط - النحل : ١٢٥

"তোমরা মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দাও কৌশল ও উত্তম উপদেশ সহকারে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পদ্ধতিতে।"

—সূরা আন নহল ঃ ১২৫

এক বিরাট জিজ্ঞাসা

বয়স, সময় ও জীবন আল্লাহর অপার কুদরত ও বিরাট নেয়ামত। এ নেয়ামতের শোকরগুজারী কেবল তাঁর ইবাদাতের মাধ্যমেই সম্ভব। কিন্তু মানুষ

অকৃতজ্ঞ। আল্লাহর নেয়ামতের শোকর করে না। ইবাদাত ও ঠিকমত করে না কিংবা মোটেই করে না তাদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ প্রশ্ন করেন।

يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ○ الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ○ فِيْ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّاشَاۤءَ رَكَّبَكَ○

"হে মানুষ! কোন্ জিনিস তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে প্রতারিত করলো ? অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, সুবিন্যস্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন এবং সুষম করেছেন। তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন।"–সূরা ইনফিতার ঃ ৬-৮

এমন নিপুণ স্রষ্টাকে কিভাবে তুমি ভুলে গেলে ? সামান্যতম সৃষ্টির বৈকল্যের জন্য সকল সুখ-শান্তি ও সৌন্দর্য হারিয়ে যেতে পারে। যেমন, কানা-খোড়া, আতুর, বধির ও অঙ্গহীন হলে শান্তি ও স্বস্তি কোথায় ? কিডনী, গলব্লাডার নষ্ট হলে খাওয়ার আনন্দ উপভোগ করার কি কোনো উপায় ছিল ? এক পা বড় ও অন্য পা ছোট হলেও তো কোনো আরাম পাওয়া যেত না। পায়খানা-পেশাবের ব্যবস্থা না করলে শরীরে খাদ্য দ্রব্য কিভাবে প্রবেশ করতো এবং কিভাবে বের হতো ? কোথা থেকে শক্তি আসতো এবং কিভাবেই আল্লাহর শুকরিয়া কিংবা নাফরমানী করতো ? চিন্তাশীলদের জন্য রয়েছে তাতে চিন্তার উত্তম বিষয়বস্তু। তাই আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ –

"তোমাদের আপন সত্তার মধ্যেও রয়েছে অনেক নিদর্শন ? তোমরা কি তা দেখ না।"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ২১

এখন আমরা আল্লাহর উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব তালাশ করবো।

আল্লাহ যুবক-যুবতীদেরকে দীন পালন ও প্রতিষ্ঠার তৌফিক দিন। আমীন।

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ,
রেডিও জেদ্দা
সৌদী আরব,
৩রা নভেম্বর, ১৯৯৭,
মোতাবেক ৩রা রজব, ১৪১৮ হিঃ

১. মানব জীবনের স্তর বিন্যাস

মানুষ সৃষ্টির সেরা-আশরাফুল মাখলুকাত। তারা জমীনে আল্লাহর প্রতিনিধি। খলীফা হিসেবে নিজের আত্ম পরিচয় জানা ছাড়া যথার্থভাবে দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। মানব জীবনের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন বড়ই রহস্যময়। বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য এ বিবর্তন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়। যারা নিজেদের সত্তাকে জানতে পেরেছে তাদের পক্ষে তাদের প্রভুকে জানাও সহজতর হয়ে যায়। এজন্য বলা হয়েছে ঃ "মান আরাফা নাফসাহু, ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু।" অর্থাৎ যে নিজেকে চিনতে পারলো সে তার প্রভুকেও চিনতে পারলো। এখন আমরা মানব জীবনের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

আল্লাহ কুরআন মজীদে বলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ط وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَانَشَاءُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ ج وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ - الحج : ٥

"হে লোক সকল ! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিহান হও, তবে ভেবে দেখ, আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, পরে জমাট রক্ত থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মায়ের গর্ভে যা ইচ্ছে তা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মারা যায় এবং কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌছানো হয়।"—সূরা আল হজ্জ ঃ ৫

এ আয়াতে মানব সৃষ্টির স্তরগুলো আলোচিত হয়েছে।

এ আয়াতে বর্ণিত মানব সৃষ্টির স্তরগুলোকে প্রধান দু' ভাগে ভাগ করা যায়।

১ম স্তর

(ক) তিনি মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। সকল মানুষের সৃষ্টি উপাদানে মাটির ভূমিকা অপরিসীম। মানুষের জীবন ধারণের সকল উপাদান

মাটি থেকেই উৎপন্ন হয়। ফসল, ফল, যাবতীয় উদ্ভিদ ও গাছ-গাছড়া মাটি থেকেই সৃষ্টি। এগুলো খেয়েই প্রাণী জীবন ধারণ করে।

(খ) তিনি বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

انَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র বীর্য থেকে। উদ্দেশ্য হলো তাকে পরীক্ষা করা। আমরা তাকে শুনা ও দেখার শক্তি দিয়েছি।"

–সূরা আদ দাহর ঃ ২

এ আয়াতে মানুষকে বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। আর তাহলো, কে স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ মেনে চলে আর কে চলে না, তা পরীক্ষা করা। তিনি আরও বলেন ঃ

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ○ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ○ يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ○- الطارق : ٥-٧

"মানুষের দেখা উচিত, কি বস্তু থেকে সে সৃজিত হয়েছে। সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে। এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষ পাঁজরের মধ্য থেকে।"–সূরা আত তারেক ঃ ৫-৭

(গ) জমাট রক্ত ঃ ৪০ দিন পর নিষিক্ত বীর্য রক্ত পিণ্ডে পরিণত হয়।

(ঘ) পূর্ণাকৃতি কিংবা অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংস পিণ্ড। ৪০ দিন পর রক্তপিণ্ড মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়।

(ঙ) পরবর্তী ৪০ দিনে মাংসপিণ্ড মানবাকৃতি ধারণ করে। এরপর তিনি অসীম কুদরতের বলে ৯/১০ মাস সন্তানকে মায়ের গর্ভে ভ্রূণ আকারে রেখে দেন।

২য় স্তর

(ক) শিশু মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়। শিশুর শৈশবকাল বাল্যকাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত। এটাই শিশুদের গড়ার উপযুক্ত সময়। কাঁচা মাটি দিয়ে কুমার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে পাতিল তৈরি করে। তেমনি কচি-কাঁচা শিশুকেও গড়া যায়।

(খ) **যৌবনকাল** ঃ মনোবিজ্ঞানীদের মতে, ১৮ কিংবা ১৯ বছর থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত হচ্ছে যৌবনকাল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কৈশোর হচ্ছে যৌবনের প্রাথমিক স্তর। আর প্রৌঢ়কাল হচ্ছে যৌবনের শেষ স্তর। অর্থাৎ যৌবনকাল

কৈশোর ও প্রৌঢ়কালের মধ্যবর্তীকাল। যৌবন হচ্ছে শক্তি-সামর্থের মূল্যবান সুপ্ত সোনার খনি। যৌবনের শক্তি-সামর্থকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের কাজে লাগানোর জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। তাই যৌবনকালের আলাদা জবাবদিহি করতে হবে।

যৌবনের সৌন্দর্য-সুষমা বর্ণনাতীত। তরুণ-তরুণীকে বার্ধক্যে পৌঁছার আগে যৌবনকালের সদ্ব্যবহার করতে হবে।

(গ) বার্ধক্য ঃ সূরা হজ্জে বর্ণিত ৫নং আয়াতের শেষে আল্লাহ বলেন ঃ এরপর কিছু লোক মারা যায় কিংবা কুব্জ বয়স পর্যন্ত জীবন লাভ করে। বয়স বেশী পেলে বেশী বেশী ইবাদাত করে আল্লাহর পুরস্কার লাভের সুযোগ রয়েছে। নিষ্কর্মা বয়সে ইচ্ছা থাকলেও শক্তির অভাবে ইবাদাত করা কষ্টকর হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ط اَفَلاَ يَعْقِلُوْنَ○- يس : ٦٨

"আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকে কুঁজো-কুজো করে দেই। তবুও কি তারা বুঝে না ?"—সূরা ইয়াসিন ঃ ৬৮

কুঁজো অবস্থার উল্লেখ করে আল্লাহ বিবেকবান যুবক-যুবতীদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। একথাটিকে তিনি নিম্নভাবেও ব্যক্ত করেছেন ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ○ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ○

"আমরা মানুষকে সর্বোত্তম অবয়ব ও আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। অতপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি হীন অবস্থার চেয়েও নীচ অবস্থায়।"

—সূরা আত ত্বীন ঃ ৪-৫

বার্ধক্যের জরাজীর্ণতা মহামূল্যবান যৌবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আল্লাহ বলেন ঃ

اَلَّذِىْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ○ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ○ ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ط قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ○- السجدة : ٧-٩

"তিনিই সে সত্তা তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি

করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। তারপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রূহ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন কান, চোখ ও অন্তর। তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"–সূরা সাজদা ঃ ৭-৯

এখানে কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনার কথা বলা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে তুচ্ছ পানি তথা বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর মাতৃগর্ভে রূহ ফুঁকিয়ে দেয়া হয়েছে। তারপর ভ্রূণে কান, চোখ ও অন্তর সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এখানেও প্রতিটি স্তর অত্যন্ত কৌশলপূর্ণ এবং বৈজ্ঞানিক রহস্যের চৌরাস্তা। এমন নিপুণ সৃষ্টি কৌশল দেখেও কমসংখ্যক মানুষই আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। একথাই আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন ঃ

وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلاَ تُبْصِرُوْنَ ۝-

"তোমাদের আপন সত্তার মধ্যেও রয়েছে অনেক নিদর্শন। তোমরা কি তা দেখ না?"–সূরা আয যারিয়াত ঃ ২১

মানব সৃষ্টির স্তর বিন্যাস সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ط يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ج وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ۝

"মহান আল্লাহ, তিনি দুর্বল অবস্থা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর দুর্বলতার পর্যায় শেষে শক্তি দান করেছেন। অতপর শক্তি-সামর্থের পর্যায় শেষে দুর্বলতা ও বার্ধক্য দান করেছেন। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।"–সূরা আর রূম ঃ ৫৪

এ আয়াতে যৌবনের আগে ও পরের দুর্বল পর্যায় এবং যৌবনের শক্তি-সামর্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মানব সৃষ্টি সম্পর্কে আরো পরিষ্কার ধারণা দিয়ে আল্লাহ মানুষকে আরো বেশী সজাগ করতে চান। তিনি বলেন ঃ

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْآ اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ج وَمِنْكُم مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْآ اَجَلاً مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ - المؤمن : ٦٧

"তিনিই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা, তারপর শুক্র দ্বারা, অতপর জমাট রক্ত দ্বারা, তারপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতপর তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর, এরপর বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কারও কারও এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং তোমরা নির্ধারিত কালে পৌঁছ, আর তোমরা যাতে বুঝ।"–সূরা আল মু'মিন ঃ ৬৭

এ আয়াতে ৬টি সৃষ্টি স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১. মাটি ২. শুক্র ৩. রক্তপিণ্ড ৪. শিশু ৫. যুবক ৬. বৃদ্ধ। বৃদ্ধ হওয়ার আগেও কেউ মারা যায় আর কেউ নির্ধারিত হায়াত পর্যন্ত পৌঁছে। সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়গুলোতে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে চিন্তার খোরাক। একজন মুসলিম গবেষক ও ডাক্তার সৃষ্টির এ সকল পর্যায় নিয়ে চিন্তা করলে অবশ্যই আল্লাহর খাঁটি গোলামে পরিণত হতে পারে।

যুবক-যুবতী যেন নিজের শক্তি-সামর্থের দাপটে মৃত্যুর কথা ভুলে না যায়। লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী মৃত্যুবরণ করেছে এবং তাদের যৌবন মাটিতে মিশে গেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মৃত্যু বরণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى○ - طه : ٥٥

"এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই আবার তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবো এবং তা থেকেই আবার তোমাদেরকে হাশরে উঠাবো।"–সূরা ত্বাহা ঃ ৫৫

চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানব জীবনের পরিবর্তনগুলোকে নিম্নোক্ত পর্যায়ে ভাগ করা যায় ঃ

১. মায়ের গর্ভে অবস্থানকালীন মেয়াদ।

২. জন্মের পর থেকে এক বছর।

৩. স্কুল পূর্ব বয়স ঃ ২ থেকে ৪ বছর।

৪. স্কুলকালীন সময় ঃ ৫ থেকে ১৫ বছর।

৫. কৈশোর ঃ ১১ থেকে ২০ বছর।

৬. ২১ থেকে উপরের দিকে বার্ধক্যের পূর্ব পর্যন্ত।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের এ পর্যায়গুলো ছাড়াও আরও কিছু বিষয় সাধারণভাবে বিবেচনা করা হয়। যেমন, ৪০ বছর বয়সে যৌবন সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ কারণে নবীরা ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে তা ক্ষয় হতে থাকে এবং বার্ধক্যের প্রাথমিক লক্ষণগুলো

একটার পর একটা দেখা দেয়। যেমন, দাঁত পড়া, চুল পাকা, ডায়াবেটিস, রক্তচাপ ও হৃদরোগ ইত্যাদি জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়া। ক্ষয়িষ্ণু যৌবনের এ ধারা বার্ধক্যের কিছু আগে প্রৌঢ়কাল হিসেবে বিবেচিত। প্রৌঢ়কাল যৌবনের বিলম্বিত অংশ।

২. কৈশোর

ইসলামের দৃষ্টিতে কৈশোর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বালেগ হলেই শরীয়তের আদেশ-নিষেধ মানা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। নাবালেগের উপর শরীয়তের বিধান কার্যকর হয় না। তারা নিষ্পাপ।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসীমা হল ১০-১৯ বছর। এ সময়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল দ্রুত শারীরিক পরিবর্তন। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে এ পরিবর্তন কয়েক বছর আগে শুরু হয়। তাই বলা যায় শারীরিক পরিবর্তন মেয়েদের বেলায় ১০ থেকে ১৬ বছর এবং ছেলেদের বেলায় ১৩ থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত। সাধারণভাবে কিশোর-কিশোরীর বয়ঃসীমা ১০ থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত বলা হয়। এ বয়সে তারা লম্বা হয়, বিভিন্ন অঙ্গ এবং যৌনাঙ্গ সুগঠিত হয়। পাকস্থলী, ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ে।

৩. যুব বয়সের স্বাভাবিক পরিবর্তনসমূহ

আমরা যুব বয়স বলতে ইসলামী পরিভাষার বালেগ বয়সকে বুঝাবো। আর তাহলো, কৈশোরের মাঝামাঝি এবং যুবক বয়সের প্রাথমিক পর্যায়। কেননা, তাদের জন্যই শরীয়তের বিধান প্রযোজ্য। এখন আমরা দেখবো কিভাবে একজন শিশু যুবক বা যুবতী হয়। এটা জানতে পারলে এর হক আদায় করা সহজতর হবে।

এ সময়ে ছেলে-মেয়েদের গনাডাল ও এড্রিনাল গ্রন্থি নিঃসৃত ও মস্তিষ্কের হাইপোথালমাস এবং পিটুইটারী গ্রন্থি নিয়ন্ত্রিত হরমোনের প্রভাবে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়। মূলতঃ যৌবন শারীরিক এ রহস্যেরই নাম। এখন আমরা এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করবো।

পুরুষের হরমোন

ছেলেদের হরমোনকে ANDROGEN বলা হয়। ANDROGEN হচ্ছে ঐ জাতীয় জৈবিক উপাদান যা শরীরকে পুরুষসূলভ ব্যক্তিত্ব ও কাঠামোতে

রূপান্তরিত করে। এ হরমোনগুলোর নাম হচ্ছে, TESTOSTERON ও ANDROSTENEDIONE। পুরুষের ANDROGEN শুধু ব্যক্তিত্ব বিকাশ-শারীরিক ও মানসিক গঠনের জন্যই অপরিহার্য নয়। বরং এটা আল্লাহ পাকের এমন কুদরতী উপাদান যা গর্ভধারী মায়ের গর্ভফুল (PLACENTA) থেকে নিঃসৃত হয়ে ভ্রুণকে মাতৃ জরায়ুতে পরিপূর্ণ মানব শিশুতে রূপান্তরিত করতে অপরিসীম ভূমিকা রাখে। পুরুষের সকল জৈবিক পরিবর্তন এ হরমোনের প্রভাবেই হয়। TESTOSTERON যৌবনে শরীরের বিপাকীয় প্রক্রিয়াকে প্রায় ১৫% বৃদ্ধি করে। যৌবন বয়সে শরীর ও মনের হিম্মত আনুপাতিক হারে এভাবেই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। ভাঙ্গা-গড়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষা, সুখী-সুন্দর সমাজ বিনির্মাণ, সংসার গঠন এবং বংশ পরম্পরা বজায় রাখা সবই এণ্ড্রোজেন হরমোনের প্রভাবে হয়ে থাকে। মায়ের আঁচলের শীতলতা থেকে বাইরে এসে স্বাতন্ত্র সৃষ্টিকল্পে এ সমস্ত উপাদান জীবন সংগ্রামের ঢেউয়ের উজানে সাঁতার কাটতে উদ্বুদ্ধ করে। শুধুমাত্র এ হরমোনের প্রভাবে আল্লাহ পাক পুরুষের কণ্ঠস্বরকে নারী কণ্ঠ থেকে আলাদা করেছেন। নওজোয়ানী বয়স থেকে চল্লিশের কোটা পর্যন্ত এ হরমোনের আধিক্য থাকে। তারপর আস্তে আস্তে ভাটা পড়ে। জোয়ানের সম্ভাবনা চিরদিনের মত বিলীন হয়ে যায়। সাথে সাথে পুরুষের শারীরিক, মানসিক ও জৈবিক কর্মকাণ্ডে পরিবর্তন দেখা যায়।

নারীর হরমোন

মহিলাদের শরীরের হরমোন হচ্ছে, ESTROGEN ও PROGESTERON। এ হরমোনদ্বয়ের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া কিশোরের সূচনা থেকে একজন কিশোরীকে পূর্ণ যুবতীতে রূপান্তরিত করে। নারীদেহের সকল নারীসুলভ গঠন ও বৈশিষ্ট্য এ হরমোনগুলোর প্রভাবে হয়ে থাকে। কৈশোর, যৌবন ও মাতৃত্ব থেকে শুরু করে বার্ধক্যের সূচনা পর্যন্ত এ দু'টো হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন নারীর কমনীয়তা সৃষ্টিতে পর্যন্ত ESTROGEN প্রধান ভূমিকা রাখে। জীবনের উদ্দাম, ভবিষ্যতের স্বপ্নিল কল্পনা ও পরিবার গঠন এসব হরমোনের প্রভাবেই হয়ে থাকে। এসব হরমোনের কমতি ও অনিয়মিত বৃদ্ধিতে নারীসুলভ শারীরিক ও মানসিক গঠন বিঘ্নিত হয় এবং অনাকাঙ্ক্ষিত রোগের সৃষ্টি হয়। দুনিয়ার রূপ, রস ও স্বাদ-গন্ধ থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

চল্লিশোর্ধ বয়সে এ দু'টো হরমোনের আধিক্যে ঘাটতি পড়ে। বিশেষ করে এস্ট্রোজেনের স্বল্পতায় PRE-MENOPOSAL SYNDROME নামে একটা শারীরিক ও মানসিক স্থবিরতার সৃষ্টি হয়। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর সন্ধিক্ষণের বয়সটা মহিলাদের জন্য সংকটজনক। এটা সকল মহিলার জন্য প্রযোজ্য। এ সময় খিটখিটে মেজাজ, শারীরিক দুর্বলতা, দুশ্চিন্তা ও স্নায়ুবিক দৌর্বল্য ইত্যাদি

দেখা যায়। যৌবনের উচ্ছলতা, কর্মোদ্দীপনা ও উৎসাহ যে, আল্লাহর কত বড় নেয়ামত তা বুড়োরা ছাড়া আর কেউ উপলব্ধি করতে পারে না।

৪. বার্ধক্য

বার্ধক্য অনাকাঙ্ক্ষিত। কেননা, তা হচ্ছে, এক রকম অচলাবস্থা। বৃদ্ধরা প্রায়ই বলে থাকেন, এত কষ্ট সহ্য হয় না, আল্লাহ যদি তুলে নিতেন। স্বয়ং মহানবী (স)-ও অচল বার্ধক্য থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন।

সুন্দর-সুঠাম অবয়বে গঠিত মানুষের বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে শারীরিক, মানসিক এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এমনকি কোষে কোষে স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। বংশগত প্রভাব, খাদ্য, পেশা, পারিপার্শ্বিক, সামাজিক প্রভাব ও রোগ-শোক বুড়ো বয়সের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে। এ বয়সে TESTOSTERON, ESTROGEN, ও PROGESTERON -এর পাল তোলা নৌকার গতিবেগ শ্লথ হয়ে আসতে থাকে। আত্মবিধ্বংসী FREE RADICAL শরীরে পুঞ্জীভূত হতে থাকে। FREE RADICAL হচ্ছে এমন এক রাসায়নিক উপাদান যার বাইরের কক্ষ পথে বেজোড় ইলেকট্রোন উপস্থিত থাকে। এ বেজোড় ইলেকট্রোন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোষে কোষে আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে দিন দিন ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিয়ে যায়। এভাবেই একজন উচ্ছল তরুণ-তরুণী কাল পরিক্রমায় বার্ধক্যের বেলা ভূমিতে এসে উপনীত হয়। আল্লাহ পাকের সৃষ্টি মানুষের জীবন চক্রের এ অমোঘ পরিণতি সবাইকে বরণ করতে হয়।

সৃষ্টিগত পরিবর্তন চক্র সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

مَالَكُمْ لاَتَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًاO وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًاO - نوح : ١٣-١٤

"তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান আশা করছ না, অথচ তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন।"

--সূরা আন নূহ ঃ ১৩-১৪

আল্লাহ বার্ধক্য সম্পর্কে বলেন ঃ

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰكُمْ لا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَىْ لاَيَعْلَمَ

بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌO - النحل : ٧٠

"আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাদেরকে মৃত্যুদান করেন। তোমাদের মধ্যে কাউকে পৌছানো হয় জ্বরাগ্রস্ত অকর্মণ্য বয়সে

অর্থাৎ বার্ধক্যে, ফলে যা কিছু তারা জানত সে সম্পর্কে তারা সজ্ঞান থাকে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবিজ্ঞ সর্বশক্তিমান।"–সূরা আন নহল ঃ ৭০

বৃদ্ধাবস্থা শৈশবের দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার সাথে তুল্য। শিশুরা জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী নয়। তাদের হাত-পা দুর্বল ও অক্ষম। তারা ক্ষুধা-পিপাসা নিবারণ এবং উঠাবসা করতে অপরের মুখাপেক্ষী। এরপর আল্লাহ্ তাদেরকে যৌবন দান করেছেন। এটা হচ্ছে উন্নতির যুগ। পরে ক্রমান্বয়ে তাদেরকে বার্ধক্যের স্তরে পৌছে দেন। এখানে জ্বরাগ্রস্ত অকর্মণ্য বয়স দ্বারা সে বার্ধক্যকেই বুঝানো হয়েছে।

নবী (স) বার্ধক্যের অচলাবস্থা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চেয়েছেন। তিনি দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ سُوْءِ الْعُمُرِ -

"হে আল্লাহ ! আমি মন্দ বয়স থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰی اَرْذَلِ الْعُمُرِ -

"হে আল্লাহ ! আমি অকর্মণ্য বয়সে ফিরিয়ে দেয়া থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

জ্বরা, স্থবির, অকর্মণ্য বয়স বলতে কুরআন বলছে 'যে বয়সে হুঁশ-জ্ঞান অবশিষ্ট না থাকে। ফলে জানা বিষয়ও ভুলে যায়।' কেউ কেউ ৮০ বছর বয়সকে এবং কেউ ৯০ বছর বয়সকে জ্বরাগ্রস্ত অকর্মণ্য বয়স বলে আখ্যায়িত করেছেন। হযরত আলী (রা) থেকে ৭৫ বছর বয়সের কথা বর্ণিত আছে। এটাই বার্ধক্যের বয়স।[১]

আল্লাহর অপার কুদরতে আজকের শক্তিবান যুবক-যুবতী আগামীকালকের অচল বুড়া-বুড়ী। নানা রোগ-শোকে জর্জরিত। শক্তি ও কর্মক্ষমতাহীন। আগের মত আর কাজে অংশ নিতে পারে না। সমস্যার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। দুঃখ-বেদনার অন্ত নেই। তাই প্রখ্যাত আরব কবি আবুল আতাহিয়াহ্ বলেছেন ঃ

فَيَالَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ يَوْمًا

فَاُخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيْبُ -

---

১. মাআরেফুল কুরআন।–(সূরা নাহল ৭০নং আয়াত)

"হায় আসতো যদি ফিরে আবার মহান যৌবন
অবহিত করতাম তাকে বার্ধক্যের কীর্তন।"

কবি এতে বার্ধক্যের জরাজীর্ণতা, দুঃখ-ব্যথা, অক্ষমতা, অপারগতা এবং ক্ষোভ ও আফসোসের কথা দারুণ আবেগের সাথে প্রকাশ করেছেন।

তবে বার্ধক্য অত্যন্ত মূল্যবান। দুর্বলতা-অক্ষমতা সত্বেও অভিজ্ঞতার এ স্তরে পৌছে বৃদ্ধরা পূর্ণতা অর্জন করেছে। তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ মূল্যবান পরামর্শ যুবক-যুবতীর পথের দিশা। অধিকন্তু তাদের দোয়া ও শুভ কামনা যুবকদের পাথেয়।

যুবক-যুবতীদের জন্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে। ক্রমশঃ অবসর নিচ্ছে কর্মক্ষেত্র থেকে এবং দুনিয়া থেকে। তাদের দায়িত্ব এসে পড়ছে যুবক-যুবতীর উপর। যুবক-যুবতীদেরকে তাদের শূন্যস্থান পূরণ করতে হচ্ছে। মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীতে একথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ج - ال عمران : ١٤٠

"আমি যামানাকে মানুষের মধ্যে আবর্তন করি।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪০

৫. সকল বয়সের লোকের প্রতি আল্লাহর অপার করুণা

আল্লাহ্ সকল বয়সের লোকের প্রতি বিশেষ করুণা বর্ষণ করেছেন। আল্লাহর কাছে সকল স্তরের বয়সের রয়েছে বিশেষ মর্যাদা। মুসনাদে আহমদ এবং মুসনাদে আবি ইয়ালায় বর্ণিত, হযরত আনাস বিন মালেকের এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ "বালেগ না হওয়া পর্যন্ত সন্তানের নেক আমল মা-বাপের আমলনামায় লেখা হয়। কোনো নাবালেগ সন্তান পাপ করলে তা তার আমলনামায় লেখা হয় না এবং মা-বাপের আমলনামায়ও লেখা হয় না। বালেগ হয়ে গেলে তার আমলনামা চালু হয়ে যায়। তখন তার হেফাজত ও তাকে শক্তি যোগানোর জন্য সাথের ২জন ফেরেশতাকে আদেশ করা হয়।

১ম চার অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. পবিত্র কুরআন মজীদ ২. TEXT BOOK OF MEDICAL PHISIOLOGY BY GUYTON ৩. SYNOPSIS OF PSYCHIATRY BY -HAROLD 1. 8. ROBBINS PATHOLOGICAL BASIS OF DISEASE BY KAPLAN ৫. গার্হস্থ্ অর্থনীতি ঃ হোসনে আরা আমিন এবং নঈমা আখতার।

যখন সে মুসলমান অবস্থায় চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে যায়, তখন আল্লাহ তাকে পাগল, কুষ্ঠ ও ধবল কুষ্ঠ—এ তিন রোগ থেকে নিরাপদ করে দেন। ৫০ বছর বয়সে পৌঁছলে আল্লাহ তাঁর হিসেব হালকা করে দেন। ৬০ বছর বয়সে পৌঁছলে সে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের তাওফীক পায়। ৭০ বছর বয়সে পৌঁছলে আসমানের ফেরেশতারা তাকে ভালবাসতে থাকে। ৮০ বছর বয়সে পৌঁছলে আল্লাহ তার নেক আমল লিখেন এবং গুনাহর কাজগুলো মাফ করে দেন। ৯০ বছর বয়সে আল্লাহ তার অতীত ও ভবিষ্যতের গুনাহ মাফ করে দেন। এবং তাকে তার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে সুপারিশ করার অধিকার দেন ও তা কবুল করেন। তখন তার উপাধি হয়ে যায় 'আসীরুল্লাহ' কিংবা 'আসীরুল্লাহ ফিল্ আরদ' অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহর আটকে পড়া বান্দাহ। (কেননা এ বয়সে সাধাণরত শক্তি শেষ হয়ে যায় এবং কোনো কিছুতে ঔৎসুক্য অবশিষ্ট থাকে না। সে কারাবন্দীর মত জীবন যাপন করে।) তারপর মানুষ যখন أَرْذَلِ الْعُمُرِ 'নিষ্কর্ম বয়সে' পৌঁছে যায়, তখন সুস্থ ও শক্তিবান অবস্থায় যেসব নেক কাজ করতো তা অব্যাহতভাবে তার আমলনামায় লেখা হয় এবং কোনো গুনাহর কাজ হয়ে গেলে তা লেখা হয় না।"

হাফেজ ইবনে কাসীর এ বর্ণনাটি মুসনাদে আবি ইয়ালা থেকে উল্লেখ করে বলেন, হাদীসটি 'গরীব' এবং তাতে ঘোর আপত্তির কারণ রয়েছে। এরপর তিনি বলেন ঃ তা সত্ত্বেও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল হাদীসটি মাওকুফ (সাহাবী থেকে) এবং মারফু [রাসূলুল্লাহ (স) থেকে] উভয় প্রকার রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর বিষয়বস্তু প্রায় তাই যা মুসনাদে আবু ইয়ালা থেকে বর্ণিত হয়েছে।[১]

মোমেন বৃদ্ধ হলে আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা বাড়ে। আর এ জাতীয় বৃদ্ধরাও আল্লাহকে পরম ভালবাসেন।

আমর বিন শোআইব নিজ পিতা থেকে এবং তিনি আমরের দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (স) বলেছেন ঃ

لَاتَنْتَفُ الشَّيْبُ فَانَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ فِي الْاِسْلَامِ اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً -

"পাকা চুল তোলা যাবে না, কেননা, তা মুসলমানের নূর। চুল পাকার মাধ্যমে কোনো মুসলমান বৃদ্ধ হলে আল্লাহ তার জন্য বার্ধক্যের ঐ

১. মাআরেফুল কুরআন–সূরা হজ্জের ৬নং আয়াতের তাফসীর থেকে গৃহীত।

নিদর্শনের বিনিময়ে একটি নেক লেখেন, একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং একটি গুনাহ্ মিটিয়ে দেন।"

–আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসাঈ, ইবনু মাজা।

হাদীসে বার্ধক্যের পাকা চুলের কতইনা মর্যাদার কথা বলা হয়েছে ! তাই বার্ধক্য বোঝা নয়, বরং নেয়ামত। যদিও বাহ্যিক কষ্ট অপরিসীম। বার্ধক্যকে Grace Period এবং যৌবনকালকে Responsible Period বলা যায়। বার্ধক্য মর্যাদার স্তর আর যৌবন জবাবদিহির স্তর। কেননা এ স্তর হচ্ছে শক্তি, শৌর্য-বীর্য ও দুরন্তপনার নাম।

বৃদ্ধদের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

خِيَارُكُمْ اَطْوَلُكُمْ اَعْمَارًا وَاَحْسَنُكُمْ اِسْلاَمًا -

"তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে বয়োবৃদ্ধ এবং ভাল মুসলমান।"[১]

তিনি আরো বলেছেন ঃ

لاَيَزِيْدُ الْمُؤْمِنُ مِنْ عُمْرِهِ اِلاَّ خَيْرًا -

"মোমেনের বয়সের আধিক্য তার জন্য কল্যাণ ছাড়া আর কিছু বহন করে না।"[২]

রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেছেন ঃ

خَيْرُكُمْ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ -

"তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যার হায়াত বেড়েছে এবং আমল ভাল হয়েছে।"[৩]

তিনি আরো বলেছেন ঃ

اَمَرَنِى جِبْرِيلُ اَنْ اُقَدِّمَ الْاَكَابِرَ -

"জিবরীল আমাকে বয়সে বড় লোকদেরকে আগে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।"[৪]

অর্থাৎ প্রথমে তাদের থেকে শুরু করার কথা বলেছে।

মহানবী (স) আরো বলেছেন ঃ

---

১. সাপ্তাহিক আদ-দাওয়াহ–৫ই অক্টোবর, ২০০০, রিয়াদ।
২. ঐ,
৩. ঐ,
৪. ঐ,

إِذَا أَتَاكُمْ كَبِيْرُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوْهُ ـ

"তোমাদের কাছে কাওমের বয়স্ক লোকেরা আসলে তাদেরকে সম্মান কর।"[১]

তিনি আরো বলেছেন ঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا

"সে আমাদের মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয় যে ছোটকে দয়া করে না এবং বড়কে সম্মান করে না।"

৬. যৌবনকাল জীবনের সেরা স্তর

যৌবন মানে শক্তি। শৈশব ও বার্ধক্যের দুর্বলতার সাথে তুলনা করলেই বুঝা যায় এ শক্তি কত মহান ! একথাই মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালা অত্যন্ত বিজ্ঞতা ও কৌশলের সাথে সকল স্তরের মানুষের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ط ـ الروم : ٥٤

"মহান আল্লাহ–তিনিই দুর্বল অবস্থা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর দুর্বলতার পর্যায় শেষে শক্তি দান করেছেন, অতপর শক্তি-সামর্থের পর্যায় শেষে দুর্বলতা ও বার্ধক্য দান করেছেন।"–সূরা আর রূম ঃ ৫৪

এ আয়াতে, মানব জীবনের তিনটি পর্যায়ের উল্লেখ করা হয়েছে। ১. নাপাক পানি, মাতৃগর্ভের দুর্বল ও জটিল ভ্রূণ এবং শৈশবের দুর্বলতা। শিশু অন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তার কোনো শক্তি নেই। সে খুবই দুর্বল। ২. যৌবনকাল। এটাকে শক্তির পর্যায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যুবক-যুবতীর শারীরিক শক্তি রয়েছে। তারাই শিশু ও বৃদ্ধের সেবা করে। যৌবন হল, শক্তির পরমাণু অস্ত্র। এ অস্ত্র দিয়ে ভাল-মন্দ সবকিছুই করা যায়। যুক্তির দাবী হল, শক্তি বা যৌবনের যিনি স্রষ্টা তার আদেশ পালন করতে গিয়ে এ পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ করা। ৩. বার্ধক্যের দুর্বলতা। দুটো দুর্বলতার মধ্যবর্তী স্তর হচ্ছে যৌবন। অর্থাৎ যৌবনের আগেও দুর্বলতা, পরেও দুর্বলতা। যৌবন ঊর্ধজগতের শ্রেষ্ঠ উপহার।

১. সাপ্তাহিক আদ-দাওয়াহ–৫ই অক্টোবর, ২০০০, রিয়াদ।

যৌবনই জীবন। শিশু ও বৃদ্ধরা দুনিয়া থেকে তেমন একটা উপকার গ্রহণ করতে সক্ষম নয়। যুবক-যুবতীরাই দুনিয়াকে ভোগ করে, নেতৃত্ব দেয়, ভাঙ্গে-গড়ে ; এখানে তাদেরই একচ্ছত্র আধিপত্য। দুনিয়া যুবক-যুবতীদের জন্যই। আর পরকালে তো কোনো লোক বৃদ্ধই থাকবে না, সবই যুবক-নওজোয়ান। সেখানে সকল মর্যাদা যুবক-যুবতীর। তাই যৌবন পরম বেহেশতী সওগাত।

একদিন[১] মহানবী (স)-এর কাছে এক বৃদ্ধা এসে বলেন ঃ হে আল্লাহর নবী ! দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকে বেহেশত নসীব করেন। তিনি উত্তরে বলেন ঃ হে অমুকের মা ! বেহেশতে কোনো বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না। বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে চলে যেতে থাকলো। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ বৃদ্ধাকে জানিয়ে দাও, সে বৃদ্ধাবস্থায় বেহেশতে প্রবেশ করবে না। (অর্থাৎ যুবতী হিসেবে প্রবেশ করবে) তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পাঠ করেন ঃ

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ۝ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ۝ عُرُبًا أَتْرَابًا ۝ لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝

"আমি বেহেশতী নারীদেরকে বিশেষ রূপে সৃষ্টি করেছি। অতপর তাদেরকে ডানহাতে আমলনামা প্রাপ্তদের জন্য চিরকুমারী, স্বামী সোহাগিনী-কামিনী ও সমবয়স্কা বানিয়েছি।"—সূরা ওয়াকেয়া ঃ ৩৫-৩৮

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, বেহেশতে প্রত্যেকের বয়স তেত্রিশ বছর হবে। নারী-পুরুষ সবাই পূর্ণ যুবক হবে। বৃদ্ধরাও যুবক হয়ে বেহেশতে যাবে। তাদের যৌবন আর কোনো দিন ফুরাবে না।

উপরোক্ত আয়াতগুলোর ভিত্তিতে দুনিয়ার যেসব নারী বেহেশতে যাবে, তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ রূপ হল, যারা দুনিয়াতে কুশ্রী, কৃষ্ণাঙ্গী কিংবা বৃদ্ধা ছিল, বেহেশতে তাদেরকে সুশ্রী, যুবতী ও লাবণ্যময়ী করে দেয়া হবে। এ আয়াত-গুলোর তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, যেসব নারী দুনিয়ায় বৃদ্ধা, শ্বেত কেশিনী ও কদাকার ছিল, বেহেশতে তাদেরকে সুন্দরী ও ষোড়ষী যুবতী হিসেবে নতুন করে সৃষ্টি করা হবে। বেহেশতের হুরদের ক্ষেত্রে বিশেষ রূপ হল, তাদেরকে বেহেশতের মধ্যেই প্রজননক্রিয়া ছাড়া সৃষ্টি করা হয়েছে। যৌবনকাল নিঃসন্দেহে ঈর্ষার বিষয়, বেহেশতী উপহার ও মহামূল্যবান সম্পদ। দাঁত থাকতে যেন আমরা দাঁতের মর্যাদা বুঝি।

যৌবনকাল হচ্ছে সুন্দর রক্তিম গোলাপ। ফুলের সৌন্দর্য ও ঘ্রাণের প্রতি আকর্ষণ চিরন্তন। শৈশবকাল হচ্ছে মায়া-মমতা ও স্নেহ-আদরের পর্ব। এ পর্ব

---

১. শামায়েলে তিরমিজী।

শেষে কৈশোর ও যৌবন হচ্ছে সুন্দরের প্রতীক ও দায়িত্ব গ্রহণের পর্ব। স্রষ্টা ষোলকলায় যৌবনের সৌন্দর্য ভরে দেন। যৌবনকালে প্রাণীকূলের সৌন্দর্য চিত্তাকর্ষক এবং উদ্ভিদ জগতের সৌন্দর্য চির হরিৎ। পাখী ছানার কোমলতা এবং চারা গাছের নমনীয়তা মন মাতানো মনোমুগ্ধকর। ফুলে ফলে সুশোভিত গাছের যৌবন—সৌন্দর্য শুধু মানুষ নয়, ভোমর এবং মৌমাছিকেও আকর্ষণ করে। যুব ষাঁড়ের মনোরম পশম, সিংহের মনোলোভা কেশর, মোরগের মাথার রক্তিম চুটী এবং পায়রার দেহের হৃদয়গ্রাহী আবরণ দেখে কার মন না জুড়ায়?

প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের ন্যায় মানুষের যৌবনও তেমনি চিরসুন্দর, আকর্ষণীয় ও মনোহর। তা সৌন্দর্য, পূর্ণতা, শক্তি, দায়িত্ব ও গুণের সমাহার। আল্লাহ বলেন ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ-

"আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর আকৃতিতে তৈরি করেছি।"–সূরা তীন ঃ ৪

যৌবনকাল হচ্ছে মানব জীবনের সেই সুন্দর পুষ্প-পাঁপড়ি।

যৌবনকালকে নদীর জোয়ারের সাথে তুলনা করা যায়, যখন তা কানায় কানায় ভর্তি থাকে। আর বার্ধক্য হচ্ছে জীবন নদের ভাটা। জোয়ার ভাটার মতই জীবন। বার্ধক্য হচ্ছে স্রোতবিহীন নদী। কবির ভাষায় ঃ

"যে নদী হারায় স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবাল ধাম বাঁধে আসি তারে।"

বিশ্বের সকল বিপ্লব ও পরিবর্তনের মূলে রয়েছে যুব সমাজ। তাই তারা বিপ্লবী-বিদ্রোহী।

জগতের বেশীর ভাগ কাজই যুবক-যুবতীরা আঞ্জাম দেয়। সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনের চাকা এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির বাহনকে তারাই সচল রাখে। তাই তারা একনিষ্ঠ দুর্বার কর্মী।

সকল পেশা-নেশা যুবকদের জন্যই, তারাই সমাজকে গতিশীল রাখে। তারা হয় আধুনিক পেশাজীবি। তারাই ছাত্র-শিক্ষক, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, নায়ক-নায়িকা, সাহিত্যিক-সাংবাদিক, নেতা-কর্মী, কৃষক-শ্রমিক, কুলি-মজুর, পুলিশ, মিলিটারী, কামার-কুমার, গায়ক-গায়িকা, তাঁতী-জেলে, শিল্পী-কারিগর, কর্মকর্তা-কর্মচারী, খেলোয়াড়, চাকুরীজীবি ও আবিষ্কারক-গবেষক।

যুবক-যুবতীরা শক্তি ও গতি। দুনিয়ার সকল শক্তি তাদের পদানত। আল্লাহ বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ - لقمن : ٢٠

"তোমরা কি দেখনি, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আসমান ও যমীনের সকল কিছু অধীন করে দিয়েছেন ?"–সূরা লুকমান ঃ ২০

শিশু ও বৃদ্ধরা নিশ্চয়ই এ শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে না। যারা সে সকল শক্তি ও বিষয়কে আয়ত্বে এনে কাজে লাগাবে তারা হল, গবেষক তরুণ-তরুণী।

যুবক-যুবতীরাই বিয়ে-শাদী করে, সংসার গড়ে, বাপ ও স্বামী-স্ত্রী ও মা হিসেবে সংসার চালায়। আল্লাহর পথের দায়ী', আহ্বানকারী হিসেবে কল্যাণকারীর ভূমিকা পালন করে। তারাই আল্লাহর রাস্তায় জান দেয়, মাল দেয়। যুবক-যুবতীরা অমিততেজা শক্তির উৎস। বৃদ্ধদের একটা ক্ষুদ্র অংশই হয়তো এখনও যৌবনের অবশিষ্ট রেশের কারণে কিছুটা ভূমিকা পালন করে। কবিরাও যৌবনের গান গেয়েছেন। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'অগ্রপথিক' কবিতায় বলেন ঃ

'আমরা নবীন তেজ-প্রদীপ্ত বীর তরুণ
বিপদ বাঁধার কণ্ঠ ছিঁড়িয়া শুষিব খুন !
আমরা ফলাব ফুল-ফসল !
অগ্রপথিক রে যুবাদল।
জোর কদম্ চলরে চল ।।
প্রাণ-চঞ্চল প্রাচীর তরুণ, কর্মবীর,
হে মানবতার প্রতীক গর্ব উচ্চশির !
দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তোমরা দৃপ্তপদ
সকলের আগে চলিবে পাড়ায়ে গিরি ও নদ,
মরু সঞ্চর গতি চপল !
অগ্র পথিক রে পাঁওদল,
জোর কদম্ চলরে চল্ ।।

অকুতোভয় যৌবনের আজান দিতে গিয়ে কবি আরো বলেন ঃ

নিত্য অভয় উদার প্রাণ
নৌজোয়ান নৌজোয়ান
আসমানে চাঁদ দেয় আজান
নৌজোয়ান নৌজোয়ান
মৃত্যুকে তারা করে না ভয়
নৌজোয়ান নৌজোয়ান।

৭. যুব প্রকৃতি

যুব প্রকৃতি বিচিত্র। আমরা এখন উল্লেখযোগ্য কয়েটা প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করবো।[১]

১. শৈশব ও কৈশোরের নির্ভরতার গণ্ডি পেরিয়ে এখন যুবকদেরকে নিজ পায়ে দাঁড়াতে হবে। সামনে অগণিত কাজ ও বিপদ বাধার পাহাড়। শরীরের রক্ত গরম ও পেশী শক্ত। চোখে মুখে স্বপ্নিল জীবনের গর্বপূর্ণ রেখা প্রস্ফুটিত। জীবনের দীপ্ত শক্তি কঠোরতাকে জয় করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। প্রতিটি কাজেই রয়েছে যৌবন শক্তির প্রকাশ ও বিকাশ।

২. যুবক-যুবতীর রয়েছে জীবনে বহু চাহিদা। তারা সেগুলো পূরণ করতে চায়। সে জন্য তারা কঠোর সাধনা ও সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। যৌবনে রয়েছে চরম উষ্ণতা। তাতে অবগাহন করে তারা দুর্গমকে সুগম, অসম্ভবকে সম্ভব, দুঃখকে হাসি এবং অন্যায়কে ন্যায়ে পরিণত করতে বজ্র কঠোর শপথে দেদীপ্যমান। সকল চাহিদা কি পূরণ হওয়া সম্ভব ? চাহিদার যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ নির্দিষ্ট করতে হবে।

৩. দূরন্তপনা ও সাহসিকতা যৌবনের অন্যতম বলিষ্ঠতা। এ কারণে মৃত্যুকে তারা পরোয়া করে না। যে কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে সহজে জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। কোনো জিনিস সহজে বুঝতে চায় না। যদিও তা ক্ষতিকর। সে জীবনকে এক সাথে পেতে চায় এবং জগতের সকল স্বাদে ভাগ বসাতে চায়। সীমিত জীবন পরিসরে অসীম ভোগ সম্ভব নয়।

৪. যুব-যুবার দল কল্পনার রাজ্যে ভেসে বেড়ায়। যেন তা বৃষ্টির প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন সাদা মেঘ। কল্পনার গতি বিদ্যুতের গতিকেও হার মানায়। প্রত্যাশার রশি সুদীর্ঘ। অথচ স্বল্প রশি দিয়ে সোনার হরিণ শিকার করতে চায়। এক কবি যুবক-যুবতীর এ মানসিকতাকে সেই কল্পিত রূপবতী কুমারীর সাথে তুলনা করেছেন যে ঘাসের মধ্যে বেড়ায়, ফুলের উপর হাঁটে, পাও পিছলায় না এবং বাঁকা টেড়াও হয় না। হায় বাস্তবতা কি নিষ্ঠুর !

৫. সময় ও শক্তির পরিকল্পিত সদ্ব্যবহার করে না। যেন হুজুগে বাঙ্গালী। এতে মহামূল্যবান সময় ও শক্তির অপচয় হয়।

৬. ভারসাম্যহীন খরচ ঃ অর্থই কত অনর্থের মূল। অর্থের কারণেই অনেক সময় খারাপ কাজের প্রতি লোভ হয়। পিতা-মাতার অর্থ-সম্পদ খরচ করতে

---

১. আল ইনসান-আদওয়ার ওয়া আকদার, ফয়সল বিন মোহাম্মদ এরাকী, প্রকাশকাল ১৪১২ হিঃ, সাফা প্রেস, মক্কা শরীফ।

পারাই যেন নেশা। যেহেতু তা কামাই করতে নিজের কোনো কষ্ট নেই। নিজের উপার্জিত অর্থের দেদার খরচ কমই হয়।

৭. **যুবক-যুবতীর মধ্যে স্বভাবতঃ** পরিবারের ভেতর ও বাইরে বিদ্রোহের ভাবও পরিলক্ষিত হয়। তারা অভিভাবককে অমান্য, দায়িত্ব এড়ানোর মনোভাব পোষণ ও অর্থহীন কাজে সময় ব্যয় করতে আগ্রহী। এটা কি এ মহান নেয়ামতের প্রতি শুকরিয়া ?

৮. **সাহচর্য ও দলীয় জীবন যাপন ঃ** যুবক-যুবতীরা সমবয়সী সাথী-সঙ্গীদের সাহচর্য এবং তাদেরকে নিয়ে দলীয় জীবন যাপন করতে চায়। একে অপরের সাথে ভাব বিনিময় করে। দলের মধ্যে নেতা বা কর্মী হিসেবে নিজেদের ভূমিকা নির্ধারণ করে। গঠনমূলক দলীয় লক্ষ্য ও কর্মসূচীই কেবল তাদেরকে যোগ্য সদস্য বানাতে পারে।

৯. এ বয়সে যুবক-যুবতীরা সৃজনশীল কিছু করতে চায়। নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারলে খুশীতে আত্মহারা হয়ে পড়ে। এমনকি নিজে না পারলেও অন্যের সৃজনশীলতাকে স্বীকৃতি দেয়, উপভোগ করে। এ ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বসূরী মুসলিম আবিষ্কারক, গবেষক, দার্শনিক-বিজ্ঞানী সহ বর্তমান যুগের আবিষ্কারকদের অনুসরণ করলে তারা বিরাট সাফল্য অর্জন করতে পারে।

১০. **বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণঃ** যৌন আবেগ এ বয়সের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যৌন কামনা-বাসনা মানুষকে মতিভ্রম ও অন্ধ উন্মত্ত করে তোলে। একে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরী। অনিয়ন্ত্রিত যৌন আচরণ সৃষ্টির সেরা মানুষকে পশুতে পরিণত করে। সে জন্য উপযুক্ত বয়সে বিয়ে-শাদীর প্রয়োজন রয়েছে।

১১. অনুকরণপ্রিয়তা ঃ যুবক-যুবতী ও কিশোর-কিশোরীরা অনুকরণপ্রিয়। যেখানে যা দেখে তাই অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। অথচ, অন্ধ অনুকরণ ক্ষতিকর, এটা তারা বুঝতে চায় না। তাদের উচিত, আদর্শের অনুসরণ। ক্ষতিকর মতাদর্শ ও পদ্ধতির অনুকরণ থেকে দূরে থাকতে হবে। মহানবী (স) বলেছেন ঃ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি কোনো জাতি বা সম্প্রদায়কে অনুকরণ করে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।'

–আবু দাউদ-কিতাবুল লেবাস, আহমদ।

১২. হতাশা, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও মানসিক চাপ যুবক-যুবতীর জীবনে নিত্যকার ঘটনা। হতাশা থেকে মুক্তির জন্য ইসলামের রক্ষাকবচ ব্যবহার করতে হবে। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো।

১৩. দ্রুত শারীরিক পরিবর্তনের সাথে মেয়েদের মধ্যে মানসিক এবং আবেগ জনিত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মেয়েদের মধ্যে নারীসূলভ এবং ছেলেদের

মধ্যে পুরুষসূলভ আচরণ দেখা যায়। বল্গাহীন আবেগ ক্ষতিকর। একে যুক্তির লাগাম পরাতে হবে।

ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত কিশোর-কিশোরী এবং যুবক-যুবতীরাই যুক্তি-সঙ্গত ও উপযুক্ত আচরণ করতে শিখে। তাদের জীবনে দেখা যায় সুশৃঙ্খল নিয়ম-পদ্ধতি ও আচার-ব্যবহার। কিন্তু যারা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত নয়, তারা কখনও অবাস্তব অলীক চিন্তায় বিভোর হয়। তাদের সচেতন ও অবচেতন মনে আলোড়ন চলে বলে মনে এক প্রকার অস্থিরতা বিরাজ করে। মা-বাপের সাথে কলহ-দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। মা-বাপের আদেশ-নিষেধ মানতে চায় না। অনেক সময় মা-বাবাকে উপেক্ষা করে পসন্দনীয় দলের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তাদের চলাফেরা ও আচরণ সম্পর্কে মা-বাপকে সচেতন হতে হবে এবং পরামর্শের নীতি গ্রহণ করতে হবে। তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের ফলশ্রুতি স্বরূপ তাদের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। আর এটা তাদের জন্য খুবই ইতিবাচক। মা-বাবা, সন্তানের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে। কিন্তু সঠিক নির্দেশনার অভাবে তারা বিভ্রান্ত হতে পারে। কোনো কোনো সময় পরিবর্তন এত দ্রুত সাধিত হয় যে, তারা এর সাথে তাল মিলাতে পারে না। তাদেরকে বল্গাহীনভাবে চলতে দেয়া যায় না। এখান থেকেই সৃষ্টি হয় সংকট। সতর্কভাবে ধৈর্যের সাথে এর মোকাবিলা করতে পারলে পরবর্তী জীবন হবে আনন্দঘন।

৮. ইসলামে যুবক-যুবতীর বিশেষ দায়িত্ব-কর্তব্য

যৌবন আল্লাহর বিরাট নেয়ামত। এ নেয়ামতের সাথে বিশেষ দায়িত্ব কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সকল জবাবদিহি এ বয়সের সাথেই সংশ্লিষ্ট। তাই একজন ফারসী কবি বলেছেন ঃ

"দর জওয়ানী তওবা করদান শিওয়ায়ে পয়গম্বরী
ওয়াক্তে পীরে গোরগে জালেম মিশাওয়াদ পরহেজগারী ॥"

যৌবনকালের তাওবা নবী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বৃদ্ধ বয়সে বাঘও পরহেজগার সাজে।

যৌবনকালে নেক কাজ করাই কাম্য। কিন্তু কেউ যদি তা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে তাওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসতে হবে। এটাই নবীদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য।

বৃদ্ধকালে শক্তিহীন অবস্থায় পাপ কাজ ত্যাগ করা কঠিন নয়, বরং সহজ। কেননা, তখন সে অপারগ। ইচ্ছা করলেও গুনাহ্ করার শক্তি রাখে না। তখন পরহেজগারী করতে বাধ্য। শিকারে অপারগ বৃদ্ধ বাঘ কর্তৃক অন্য পশুর প্রতি অত্যাচার না করার প্রতিশ্রুতির মতই হাস্যকর।

তাই প্রিয় নবী (স) বার্ধক্য আসার আগে যৌবনের মূল্য বুঝার তাকিদ দিয়েছেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَعِظُهُ : اِغْتَنِمْ خَمْسًا شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ـ

"রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে উপদেশ দেন এবং বলেন ঃ ৫টি জিনিসকে ৫টি জিনিসের আগে মূল্যবান মনে করবে। সেগুলো হল ঃ বার্ধক্যের পূর্বে যৌবন, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতা, অভাবের পূর্বে সচ্ছলতা, ব্যস্ততার পূর্বে অবসর এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবন।"–মেশকাত

এ হাদীসে ৫টি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের মধ্যে যৌবনকাল অন্যতম বিষয় হিসেবে উল্লেখ হয়েছে। যৌবনের শক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বার্ধক্যে শিথিল হয়ে আসে। তাই মহামূল্যবান যৌবন শক্তির যথাসাধ্য সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করতে হবে। বার্ধক্যে ইচ্ছা থাকলেও অনেক নেক কাজ করা যায় না।

হাদীসে অসুখের মোকাবিলায় সুস্থতার কথার উল্লেখ এসেছে। স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। অসুখ না হলে স্বাস্থ্যের আসল মূল্য বুঝা যায় না। যেমন করে আঁধার না হলে আলোর মূল্য বুঝা যায় না। ঘরে হোক বা হাসপাতালে হোক, ব্যথা-বেদনায় জর্জরিত রোগীদের আর্তনাদে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে। কে যে কখন অসুস্থ্য হয়ে পড়বে তা বলা মুশকিল। তাই সুস্থ সময়ে নেক কাজ বেশী করতে হবে। অসুস্থ্য রোগীর পক্ষে নেক কাজ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। বার্ধক্য রোগের আঁধার। যুবক-যুবতীরাই অপেক্ষাকৃত ভাল স্বাস্থ্য ভোগ করে।

হাদীসে ধন-সম্পদের সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ হয়েছে। ধন-সম্পদ দিয়ে সওয়াবের কাজ যেমন বেশী করা যায়, তেমনি গুনাহর কাজও বেশী করা যায়। মু'মিন মুসলমানের উচিত ধন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহর কাজে এগিয়ে আসা। তাদের পক্ষেই সদকাহ জারিয়ার সুযোগ বেশী। হাদীসে এসেছে, নবী (স) বলেছেন ঃ

اِذَا مَاتَ بَنُوْا اٰدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ -

"মানুষ যখন মারা যায় তখন তিন আমল ছাড়া অন্যান্য সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। তিন আমল বা বিষয় হচ্ছে, সদকাহ জারিয়াহ, মা-বাপের জন্য দোয়াকারী সন্তান এবং উপকারী এলেম—জ্ঞানের সেবা।"-মুসলিম

মসজিদ, মাদ্রাসা, ইসলামী পাঠাগার, বিয়ে-শাদী দেয়া, রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি সমাজকল্যাণমূলক কাজ এর অন্তর্ভুক্ত। দারিদ্র্যের কালছায়া কখন যে নেমে আসবে তা বলা মুশকিল। তাই দারিদ্র্য আসার আগেই নেক কাজে বেশী বেশী অর্থ খরচ করা দরকার।

হাদীসে অবসর সময়ের সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে। সময় মহামূল্যবান। যে কোনো মহৎ কাজ ও অবদানের পেছনে সময়ের সদ্ব্যবহার এক বিরাট উপাদান। সময়কে লেখা-পড়া, জ্ঞান-গবেষণা, আবিষ্কার, নেক আমল ও কাজে ব্যয় করতে হবে। এটা না করলে আল্লাহ্ যে রকম মু'মিন মুসলমান পেতে চান সে রকম মুসলমান তৈরি হবে না। আর সময়েরও সদ্ব্যবহার হবে না।

হাদীসে মৃত্যুর আগে জীবনের মূল্য অনুধাবনের কথা এসেছে। জীবনে মানুষ বহু কাজ করে। সে কাজগুলো দরকারী, মূল্যবান ও কল্যাণমূলক কিনা, তা দেখতে হবে। মু'মিনের জীবন হলো কল্যাণের ফোয়ারা। সে কল্যাণ হবে নিজের, অপর মানুষের কিংবা অন্যান্য সৃষ্ট জীবের। কাজ নেক ও মূল্যবান না হলে বিপদ আছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ۝ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ۝

"যে এক অণু পরিমাণ নেক কাজ করবে সে এর বিনিময় দেখতে পাবে আর যে এক অণু পরিমাণ পাপ কাজ করবে সে এর শাস্তি দেখতে পাবে।"
-সূরা যিলযাল ঃ ৭-৮

আরব কবি সম্রাট শওকী বলেছেন ঃ 'জীবন হচ্ছে, ঘন্টা ও মিনিটের নাম।' ঘড়ির সেকেণ্ড ও মিনিটের কাঁটা যত দ্রুত ঘুরছে, জীবনও তেমনি দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। পেরিয়ে যাওয়া সে সেকেণ্ড ও মিনিটটা আর জীবনে ফিরে আসবে না।

এ হাদীসে বর্ণিত ৫টি জিনিসের হেফাজত ও উত্তম ব্যবহার করতে পারলে মানুষ শুধু নবী হতে পারে না, আর সবকিছু হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

لَنْ تَزُوْلَ قَدَمُ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ اَرْبَعٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا اَفْقَهُ وَعَنْ عِلْمِهٖ مَاذَا عَمِلَ فِيْهِ ـ

"কেয়ামতের দিন কোনো বান্দাহ ৪টি বিষয়ের হিসেব দানের আগে এক কদমও নড়তে পারবে না। ১. জীবনের মূল্যবান সময়কে কি কাজে লাগিয়েছে। ২. যৌবনকে কি কাজে লাগিয়েছে। ৩. অর্থ-সম্পদ কোথা থেকে আয় করেছে ও কোথায় ব্যয় করেছে এবং ৪. জ্ঞানকে কিভাবে কাজে লাগিয়েছে।"

এ হাদীসে জীবন, যৌবন, অর্থ আয়-ব্যয়ের উৎস এবং জ্ঞান সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রশ্ন করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সামান্য একটু বর্ণনার পার্থক্য সহকারে আবু বারজাহ আসলামী রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

لَاتَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهٖ فِيْمَا فَعَلَ وَعَنْ مَّالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا اَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ

"কেয়ামতের দিন ৫টি বিষয়ের হিসেবের আগে কোনো বান্দাহ দু' কদম নাড়াতে পারবে না। ১. জীবনের মূল্যবান সময়কে কি কাজে ব্যয় করেছে, ২. এলেম—জ্ঞান দ্বারা কি কাজ করেছে, ৩. কোথা থেকে অর্থোপার্জন করেছে, ৪. কোন্ কাজে তা ব্যয় করেছে এবং ৫. নিজের শরীর-স্বাস্থ্যকে কিভাবে ব্যয় করেছে।"–তিরমিজী

এ হাদীসে জীবন, এলেম, আয়-ব্যয় এবং শরীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রশ্ন করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত মানব জীবন এগুলোকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। এগুলো ঠিক হয়ে গেলে সবকিছুই ঠিক হয়ে যায়। এখানে জীবনের মধ্যে যৌবন অন্তর্ভুক্ত আছে।

আল্লাহর কাছে মানুষের জীবন-যৌবন, জ্ঞান-বুদ্ধি, আয়-ব্যয় ও শরীর-স্বাস্থ্যের মূল্য অনেক বেশী। তাই এগুলোর জন্যই তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। মহা হিসেবের দিন আসামীর কাঠগড়ায় অসহায়ভাবে দণ্ডায়মান পাপী-তাপীদেরকে কপালের চুল ও পায়ে ধরে টানা-হেঁচড়া করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ وَالْاَقْدَامِ

"সেদিন অপরাধীদেরকে তাদের চেহারা দেখে চেনা যাবে এবং মাথার চুল ও পায়ে ধরে তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে।"

–সূরা আর রাহমান ঃ ৪১

আরেক হাদীসে এসেছে, হাশরের ময়দানে বান্দাহকে সর্বপ্রথম নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلٰوَاتُهُ فَاِنْ صَلُحَتْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ خَابَ وَخَسِرَ وَاِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَةٍ قَالَ الرَّبُّ اُنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذٰلِكَ-

"হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম বান্দাহর আমলের মধ্যে নামাযের হিসেব নেয়া হবে। যদি নামাযের প্রশ্নে সে উত্তীর্ণ হতে পারে, তাহলে সে সফল। আর যদি নামায বরবাদ হয় এবং এ বিষয়ে আটকে যায়, তাহলে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে তার ফরয নামাযে কোনো ত্রুটি পাওয়া গেলে আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলবেন, আমার বান্দার নফল নামায থাকলে তা থেকে তার ফরযের ত্রুটি পূরণ করে দাও। তারপর তার যাবতীয় আমল সম্পর্কে উপরোক্ত পন্থা (ফরযের ত্রুটি নফল দিয়ে পূরণ) গৃহীত হবে।"

–তিরমিজী

শারীরিক ইবাদাতের মধ্যে সর্বপ্রধান ইবাদাত হচ্ছে নামায। নামায অতীতের সকল নবী ও তাঁদের উম্মতের উপর ফরয ছিল। যে বান্দাহ এ প্রাথমিক ও প্রধান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তার পক্ষে পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন হবে না। তাই নামায নিয়মিত ও সময়মত জামাআত সহকারে আদায় করতে হবে।

হাশরের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তির নেক ও পাপের হিসেব হবে। নেককারগণ ডান হাতে এবং পাপীরা বাম হাতে আমলনামা পাবেন। আল্লাহ বলেন ঃ

فَالْيَوْمَ لَاتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ○ يس : ٥٤

"আজকের দিনে (হাশরের দিন) কারো প্রতি যুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা আমল করবে কেবল তারই বিনিময় পাবে।"-ইয়াসিন ঃ ৫৪

অর্থাৎ দুনিয়াতে নেক করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পাপ করলে তাঁর অসন্তুষ্টি লাভ করবে।

ইসলাম মূল্যবান যৌবনের সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহারের বিষয়ে বিষদ তাকিদ দিয়েছে। তা যেন মোটেও নষ্ট না হয়, সে ব্যাপারে মহানবী (স) অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি যৌবনকে নেক পথে ব্যয়কারীদের মর্যাদা ও সৌভাগ্য সম্পর্কে যুব সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ

سَبْعَةٌ يَظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ ، اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَاَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلٰى ذٰلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَاتَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

"সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ সেই দিন নিজ (আরশের) ছায়া দান করবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। (অর্থাৎ হাশরের দিন খুব নিকটে সূর্যোদয় হবে। সবাই গরমের বিভীষিকায় নিমজ্জিত থাকবে) ১. ন্যায়পরায়ণ নেতা, শাসক ও সরকার, ২. আল্লাহর ইবাদাতের মধ্যে গড়ে উঠা যুবক-যুবতী, ৩. যে ব্যক্তির মন জামাআতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে লেগে থাকে, ৪. যে দুই ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পরস্পরকে ভালবাসে, পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলিত হয় এবং শেষে আলাদা হয়, ৫. যে ব্যক্তি খারাপ উদ্দেশ্যে সম্ভ্রান্ত ও সুন্দরী নারীর ডাকে এ জবাব দেয়, 'নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি', ৬. যে ব্যক্তি গোপনে দান করে, বাম হাত জানে না ডান হাত কি দান করেছে, ৭. যে ব্যক্তি আল্লাহকে নীরবে স্মরণ করে ও দু' চোখ বেয়ে পানি গড়ায়।"–বুখারী, মুসলিম

এ হাদীসে আল্লাহর ইবাদাতের মধ্যে গড়ে উঠা যুবক-যুবতীরা হাশরের ময়দানের কঠিন তাপে আল্লাহর আরশের ছায়া লাভকারী সাত ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভাল যুবক-যুবতীরা কতইনা সৌভাগ্যবান !

আল্লাহর কাছে যৌবনকাল অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ স্তর। তাই এ বয়সের লোকদেরকেই তিনি নবী নির্বাচন করেছেন। মানব সমাজের কাছে আল্লাহর

আইন-বিধান পৌঁছে দেয়া তাদের দায়িত্ব। নবীর অবর্তমানে কে ঐ দায়িত্ব পালন করবে ? মহানবী (স) বলেছেন ঃ اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ "ওলামায়ে কেরাম নবীদের ওয়ারিশ।" তিনি বলেছেন, নবীরা কোনো দীনার-দেরহাম রেখে যান না। রেখে যান দীনি ইল্‌ম—জ্ঞান। ওলামায়ে কেরামকে দীনি ইল্‌ম—জ্ঞানের সেবা করতে হবে। দীনি ইল্‌মের মধ্যে দাওয়াতে দীন এবং একামতে দীনও অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি মুসলমানকে দীনি জ্ঞান অর্জন করে দীনের দাওয়াত ও দীন প্রতিষ্ঠায় তৎপর হতে হবে। যুবক-যুবতীরাই পারে নবুওয়াতের রেখে যাওয়া এ মিশনকে এগিয়ে নিতে। এটা হচ্ছে নবী প্রদত্ত দায়িত্ব।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ

مَا بَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلاَّ شَابًّا وَلاَ اُوتِيَ الْعِلْمَ عَالِمٌ اِلاَّ شَابًّا ثُمَّ تَلاَ : قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُمْ اِبْرَاهِيْمُ ـ

"আল্লাহ যুবক ছাড়া কোনো নবী পাঠাননি এবং যুবক ছাড়া কাউকে ইল্‌ম দান করেননি। তারপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন ঃ 'তারা বলে, আমরা এক যুবককে মূর্তিগুলোর কথা স্মরণ করতে শুনেছি, যার নাম ইবরাহীম'।"

যুবক ইবরাহীম নবুওয়াত লাভ করার পর মূর্তি পূজার অসারতা তুলে ধরেন। তিনি যুবক হিসেবেই দীনি দাওয়াত ও দীন প্রতিষ্ঠার কাজে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি নমরূদের অত্যাচারে ইরাক থেকে সিরিয়া হিজরত করেন। সেখান থেকে ফিলিস্তিন ও মক্কা সফর করেন। রাস্তা-ঘাট ও গাড়ী-ঘোড়া বিহীন এ বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করার পেছনে যৌবনের যাদু শক্তিই কাজ করেছিল।

আল্লাহ হযরত ইউসুফ (আ) সম্পর্কে বলেন ঃ

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ط ـ يوسف : ٢٢

"তিনি যখন পূর্ণ যৌবনে পৌঁছলেন, তখন তাঁকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম।"–সূরা ইউসুফ ঃ ২২

হযরত ইউসুফ (আ)-কে যৌবনেই নবুওয়াত দান করা হয়েছে বলে এ আয়াত পরিষ্কার বলে দিচ্ছে। তিনি জীবনে বহু অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হন এবং সাফল্যের সাথে সেগুলোতে উত্তীর্ণ হন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরেক যুবককেও নবী নিযুক্ত করেন। তিনি হলেন হযরত মূসা (আ)। তিনি ফেরাউনের মত কট্টর ও নির্দয় যালেমের প্রতি আল্লাহর দীনের দাওয়াত দেন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ط ـ القصص : ١٤

"যখন মূসা (আ) ভরা যৌবনে পদার্পণ করেন এবং পরিণত বয়সে পৌঁছেন, তখন আমি তাঁকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম।"–সূরা কাসাস ঃ ১৪

আল্লাহ আরেকজন কিশোরকে নবুওয়াতের জন্য নির্বাচন করেন। তিনি হলেন হযরত ইয়াহইয়া (আ)। আল্লাহ বলেন ঃ

يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ط وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا لا ـ مريم : ١٢

"হে ইয়াহইয়া ! শক্তি সহকারে মজবুত করে কিতাব আঁকড়ে ধর। আমরা তাঁকে কৈশোরেই প্রজ্ঞা দান করেছি।"–সূরা মরিয়ম ঃ ১২

যৌবনের আরেক অমিততেজা শক্তির অধিকারী নবী হচ্ছেন হযরত ঈসা (আ)। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে তিনি ইহুদীদের শত্রুতা ও আগ্রাসনের শিকার হন। তারা তাঁকে শূল বিদ্ধ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় আল্লাহ তাঁকে জীবন্ত আসমানে তুলে নেন এবং তাঁর অনুরূপ আরেক ব্যক্তিকে শূলবিদ্ধ করিয়ে দেন। ইহুদীরা তাঁকে হত্যার আত্মপ্রসাদ লাভ করলেও আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়ে তাঁকে কেয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘজীবি করেছেন।

আসহাবে কাহাফের যুব কাহিনী আমাদের যুব সমাজের জন্য শিক্ষা ও প্রেরণার বিরাট উৎস। আল্লাহ কুরআন মজীদে বলেন ঃ

اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًاO فَضَرَبْنَا عَلٰى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًاO ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْا اَمَدًاO نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ط اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ـ الكهف : ١٠ـ١٣

"যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে তখন দোয়া করে, হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন। তখন আমি কয়েক বছরের জন্য গুহায় তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেই।

তারপর আমি তাদেরকে পুনরুত্থিত করি, একথা জানার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোন্ দল তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে অধিক নির্ণয় করতে পারে। আপনার কাছে তাদের ইতিবৃত্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।"

–সূরা কাহাফ ঃ ১০-১৩

তাফসীরবিদগণ লিখেছেন, আরবীতে ব্যবহৃত فَتًى শব্দের বহুবচন হলো فِتْيَةٌ যা উল্লেখিত আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হল 'যুবকেরা'। এ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, কর্ম সংশোধন, চরিত্র গঠন এবং হেদায়েত লাভের উপযুক্ত সময় হচ্ছে যৌবনকাল। বৃদ্ধ বয়সে পূর্ববর্তী কর্ম ও চরিত্র এত শক্তভাবে শিকড় গেড়ে বসে যে, যতই এর বিপরীত সত্য পরিস্ফুট হোক না কেন, তা থেকে বেরিয়ে আসা দুরূহ হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন যুবক।

–ইবনে কাসীর, আবু হাইয়ান

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স) যদিও শৈশব ও কৈশোরে আদর্শ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং যৌবনে মহান লোকদের মত কাজ করেছিলেন তথাপি তাঁকে যৌবন পরিপূর্ণ হওয়ার আগে নবুওয়াত দেয়া হয়নি। ৪০ বছর বয়সে যখন তিনি পরিপক্ক যৌবনে পদার্পণ করেন তখনই তাঁকে গোটা বিশ্ব মানবতার প্রতি নবী ও রাসূল হিসেবে পাঠানো হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ - الانبياء : ١٠٧

"আমি আপনাকে গোটা বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি।"

–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৭

আল্লাহ পবিত্র কুরআন মজীদে যুব চরিত্রের অনুপম আদর্শ ও চরিত্র বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

حَتّٰى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهٗ وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○ الاحقاف : ١٥

"অবশেষে মানুষ যখন শক্তি-সামর্থের বয়সে ও ৪০ বছর বয়সে পৌছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা ! আমাকে এরূপ ভাগ্য দান

কর, যাতে আমি তোমার নেয়ামতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্ম পরায়ণ কর, আমি তোমার প্রতি তাওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম।"

–সূরা আল আহকাফ ঃ ১৫

আল্লাহ এ আয়াতে পূর্ণ বয়স্ক যুবকদের কয়েকটি কাম্য গুণ উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হল, তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করে, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে ও নেক কাজ করার প্রার্থনা জানায়। তারপর সন্তানের সংশোধন, নিজের তাওবা এবং সবশেষে নিজেকে আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধের অনুগত দাস হিসেবে ঘোষণা করে। এর মধ্যেই আল্লাহ ও বান্দার হক বা অধিকার সব এসে গেছে এবং নিজের তাওবা ও দাসত্ব এবং সন্তানের সংশোধন সহ প্রয়োজনীয় সকল মৌলিক জিনিস অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

কোনো কোনো তাফসীরকার এ আয়াতকে হযরত আবু বকরের অবস্থা ও গুণাবলীর বর্ণনাকারী হিসেবে বলেছেন। যুবক আবু বকরের মধ্যে এ সকল গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। তিনি চল্লিশ বছর বয়সে পৌছে সন্তান-সন্ততির জন্য দোয়া করেন। যাই হোক, আয়াতের বিধান সকলের জন্য প্রযোজ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, সকল মুসলমান যুবককে আল্লাহর আনুগত্য এবং পরকালমুখী হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া। বিশেষ করে ৪০ বছর বয়সে যৌবনের পরিপূর্ণতার সময় সবার মধ্যে পরকাল চিন্তা প্রবল থাকা জরুরী।

নামাযের জামাআতের অনুপস্থিত লোকদের ঘর জ্বালিয়ে দেয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) যখন ইচ্ছা ব্যক্ত করেন তখন তিনি বলেন ঃ

ثُمَّ اَخْرَجُ بِفِتْيَانٍ مَعَهُمْ حُزَمُ الْحَطَبِ -

"অতপর আমি কিছু সংখ্যক যুবককে নিয়ে বের হই যাদের হাতে থাকবে জ্বালানী কাঠ।"–মুসনাদে আহমদ

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

كَانَ شَبَابٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ سَبْعِيْنَ رَجُلاً يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ -

"৭০জন আনসার যুবক ছিলেন যাদেরকে ক্বারী বলা হত।"

–মুসনাদে আহমদ

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হাফেজে কুরআনগণ ছিলেন যুবক। সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণে, আজ আমাদের যুবক-যুবতীদেরকেও হাফেজে কুরআন ও আলেম হতে হবে।

দীনি ইল্ম অর্জনের ক্ষেত্রে যুবক সাহাবীরাই ছিলেন অগ্রপথিক। একদিন মহানবী (স) কিছু লোককে বলেন ঃ

اِءْتُوْنِىْ بِاَعْلَمِكُمْ فَاُوْتِىَ بِفَتًى شَابٍّ وَقَالُوْا هٰذَا اَعْلَمُنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ -

"তোমাদের মধ্যে অধিকতর জ্ঞানী ও আলেম ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে আস। তারা এক যুবককে হাজির করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! এ-ই আমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ও আলেম।"–আবু দাউদ

আজ মুসলিম যুবক-যুবতীদের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান চর্চার প্রয়োজন সর্বাধিক। কুরআন ও হাদীসের বড় আলেম হওয়া ছাড়া ইসলামী পুনর্জাগরণ সম্ভব নয়। ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ ছিলেন যুবক ও বড় আলেম।

যুবকরা জিহাদের ময়দানেও সর্বাগ্রে ছিলেন। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

كُنَّا نَغْزُوْا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ -

"আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে জিহাদে যেতাম, তখন আমরা যুবক ছিলাম।"–মুসনাদে আহমদ

জিহাদের চূড়ান্ত রূপ হলো যুদ্ধ এবং সূচনা হলো দাওয়াত ও তাবলীগ। হক ও বাতিলের মধ্যে সংঘর্ষের চূড়ান্ত পর্যায়ে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলিম যুবকরা নবী (স)-এর নেতৃত্বে সে যুদ্ধে যোগদান করে বিজয়ের পতাকা ছিনিয়ে এনেছেন।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

يَعْجِبُكَ رَبُّكَ مِنَ الشَّابِّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ -

"তোমার প্রতিপালক সে যুবকের প্রতি আশ্চর্য হন যে সত্য থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয় না।"–মুসনাদে আহমদ

সত্যের অনুসারী এবং আমলকারী যুবক-যুবতীর মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশী। তিনি তাদের উপর খুশী। যুবকরা সত্যকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরবে যেন তারা এবং সত্য অবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

নেতৃত্ব ইসলামের এক অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনৈসলামে এর গুরুত্ব আরও বেশী। ইসলাম যুব নেতৃত্বের প্রতি অগ্রাধিকার দেয়। বরং যুব নেতৃত্ব ইসলামের বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় তিনি যুবকদের হাতে জিহাদের ঝাণ্ডা তুলে দিতেন। যেমন, হযরত আলীর হাতে খায়বারের এবং উসামা বিন যায়েদ বিন হারেসার হাতে মুতার যুদ্ধের পতাকা তুলে দেন। এছাড়াও তিনি যুবক সাহাবীদেরকে বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করতেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর যুবক দৌহিত্র হযরত হোসাইন (রা) কারবালার ময়দানে ইয়াযীদের বাহিনীর বিরুদ্ধে সত্য মিথ্যার সংগ্রামে সত্যের অনুসারী মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। শুধু তাই নয়, যুব নেতৃত্ব বেহেশত পর্যন্ত সম্প্রসারিত। তাই মহানবী (স) বলেছেন ঃ

اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَ اَشْبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

"হাসান ও হোসাইন বেহেশতের যুব নেতা হবেন।"–তিরমিজী

যৌবন পরকালের স্থায়ী ভূষণ। হাদীসে এসেছে ঃ

يُقَالُ لاَهْلِ الْجَنَّةِ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَشُبُّوْا فَلاَ تَهْرِمُوْا اَبَدًا ـ

"বেহেশতবাসীকে বলা হবে, এখন থেকে তোমরা চিরযৌবনের অধিকারী। আর কখনও বৃদ্ধ হবে না।"–মুসলিম

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَا اَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسَنِّهِ اِلاَّ قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ مَنْ يُّكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ

"কোনো যুবক বয়স্ক লোকের প্রতি সম্মান দেখালে, তার বয়স বেশী হলে, আল্লাহও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী নিয়োগ করবেন।"

–তিরমিজী হাদীসের সনদ দুর্বল।

হযরত আবু বকর (রা) হযরত ওমারের সামনে যায়েদ বিন সাবেত (রা)-কে বলেন ঃ

اِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لاَنَتَّهِمُكَ وَكُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَتَتَبَّعُ الْقُرْاٰنَ فَاجْمَعْهُ ـ

"আপনি একজন বুদ্ধিমান যুবক, আপনার বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। আপনি রাসূলুল্লাহর অহী লেখক ছিলেন। আপনি কুরআন সংগ্রহ করে তা জমা করুন।"–বুখারী

কুরআন সংগ্রহের মত অত্যধিক দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য হযরত আবু বকর যুবক সাহাবী যায়েদ বিন সাবেতের মত লোককে দায়িত্ব দেন।

রাসূলুল্লাহ (স) এক মুসলিম যুবকের মৃত্যু শয্যায় উপস্থিত হন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমার অবস্থা কেমন ? যুবকটি জবাব দেয়, হে আল্লাহর নবী ! আমি আল্লাহর রহমতের আশাবাদী। কিন্তু গুনাহর জন্যও ভয় করি। তখন নবী (স) বললেন, এমতাবস্থায় কোনো মু'মিনের অন্তরে এ দু'টো জিনিস উপস্থিত থাকলে আল্লাহ্ তার আশা পূরণ করেন এবং ভয়ের জিনিস থেকে নিরাপত্তা দান করেন।"–ইবনে মাজাহ

মৃত্যু শয্যায় একজন মুসলিম যুবকের ঈমান-আকীদা ও মনোভাব কিরূপ হওয়া উচিত, আমরা এ ঘটনা থেকে তা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

পরিবার হচ্ছে সমাজের প্রথম একক। এর মাধ্যমেই সমাজ গঠিত হয়। পরিবার গঠনের জন্য বিয়ের প্রয়োজন। সমাজের এ বিরাট প্রয়োজন পূরণ হয় যুবক-যুবতীর বিয়ের মাধ্যমে। তাই মহানবী (স) যুবকদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন :

يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ-

"হে যুব সম্প্রদায় ! তোমাদের যাদের শক্তি-সামর্থ আছে তারা যেন বিয়ে করে। এটা চোখ অবনত এবং লজ্জাস্থানের হেফাজতের জন্য সর্বোত্তম রক্ষাকবচ। যার বিয়ের সামর্থ নেই সে যেন রোজা রাখে। রোজা তার জন্য ঢাল স্বরূপ।"–বুখারী, মুসলিম

মানব জগত টিকে থাকা না থাকা নির্ভর করে বিয়ে ও পরিবার গঠনের মাধ্যমে। এটা যুবক যুবতীর জন্যই প্রযোজ্য বলে মহানবী (স) এ বিষয়ে তাদেরকে সজাগ করে দিয়েছেন।

মালেক বিন হোয়াইরাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : "আমরা সমবয়স্ক কয়েকজন যুবক নবী (স)-এর কাছে আসি এবং ২০দিন ও রাত তাঁর কাছে অবস্থান করি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও বন্ধু। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমরা আমাদের পরিবারের কাছে ফিরে আসার জন্য আগ্রহী তখন তিনি আমরা বাড়ীতে কাকে কাকে রেখে এসেছি সে বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন। তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাও, তাদের মধ্যে নামায

কায়েম কর, দীন শিক্ষা দাও, তাদেরকে আদেশ কর এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দাও। আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছ সেভাবে নামায পড়বে। নামাযের সময় হলে একজন আজান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ব্যক্তি নামাযের ইমামতি করবে।"–বুখারী

এ হাদীসে যুবকদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং দীন শেখার জন্য তাদের সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে বুঝা যায়। দীনি ইল্‌ম হাসিলের জন্য যুবকদের সফর এবং দীন শেখার এ অনুশীলন প্রয়োজন।

কেয়ামতের আগে দাজ্জালের আবির্ভাব মু'মিনদের জন্য ঈমানের বিরাট অগ্নি পরীক্ষা। যুবক-যুবতীদেরকে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। অধিকন্তু দাজ্জালের সফল প্রতিরোধ যুব সমাজ ছাড়া সম্ভব হবে না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ "দাজ্জাল পূর্ণ বয়স্ক একজন যুবককে ডাকবে। তারপর তাকে জবেহ করে দেহের দুই টুকরার মাঝে সৃষ্ট ফাঁক দিয়ে হেঁটে যাবে। যেন লোকেরা তাকে সত্যবাদী মনে করে। তারপর দাজ্জাল নিহত যুবকটিকে বলবে, উঠ, যুবকটি পুনর্জীবিত হয়ে উঠবে। তারপর জিজ্ঞেস করবে, হে যুবক ! এখন তোমার রায় কি ? যুবকটি উত্তরে বলবে ঃ তুমি যে দাজ্জাল এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে। তোমার বিরুদ্ধে মহানবী (স) আমাদেরকে সতর্ক করে গেছেন। তারপর দাজ্জাল যুবকটিকে আবারো হত্যা করার উদ্যোগ নেবে, কিন্তু পারবে না। তারপর যুবকটিকে (লোকদের ধারণা অনুযায়ী) জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবে। অথচ সেটা হল আল্লাহর জান্নাত।

অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে, তাকে তলোয়ার দিয়ে দু' টুকরো করার পর পুনরায় ডাকবে, যুবকটি হাঁসিমুখে উঠে দাঁড়াবে।"–মুসলিম

এ হাদীস বলে দিচ্ছে, যুবক মু'মিনের ঈমান এতবেশী মজবুত হবে যে, দাজ্জালের মতো পশু শক্তিও তাকে ঈমান থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

যুবকদের প্রতি মহানবী (স)-এর গুরুত্ব আরোপের শেষ নেই। তিনি তরুণ সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আব্বাসকে বললেন ঃ

يَاغُلَامُ اِنِّىْ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ اَحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ ، اِحْفَظِ اللّٰهِ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، اِذَا سَئَلْتَ فَاسْئَالِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ ـ

"হে কিশোর ! আমি তোমাকে কিছু বাক্য শিক্ষা দিচ্ছি। তুমি আল্লাহর আদেশ-নিষেধের হেফাযত কর, তিনিও তোমাকে হেফাযত করবেন। আল্লাহর সীমারেখার হেফাযত কর, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সামনে

পাবে। তুমি যখন চাইবে, আল্লাহর কাছে চাইবে, আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, আল্লাহর কাছেই করবে।"

এ হাদীসে একজন যুবক সহ সকল মুসলমানের কি করণীয় তা পরিষ্কার ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহর নির্ধারিত হালাল-হারাম ও ফরয ওয়াজিবের সীমা-রেখার হেফাযত এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ও সাহায্য চাওয়া ইসলামী ইবাদাতের সার কথা। এর মাধ্যমে মু'মিনের অন্তরে তাওহীদের স্পিরিট প্রবেশ করে এবং শিরক ও বেদআত দূরীভূত হয়। বান্দাহ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে।

এ অধ্যায়ের দীর্ঘ পরিসরে আমরা কুরআন, হাদীস ও ইসলামের ইতিহাস থেকে যুবক-যুবতীর দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

এ আলোচনায় এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্র যুবক-যুবতীর বিরাট ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদেরকেই সমাজ পরিবর্তন সহ ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের সকল কিছু পরিবর্তনের দায়িত্ব পালন করতে হবে। বীজ না লাগালে যেমন গাছ জন্মে না এবং ফল ধরে না, তেমনি সমাজের কুসংস্কার, শিরক, বেদআত, অন্যায়-অবিচার ও যুলুম-নির্যাতন বন্ধ না করলে তা চলতে থাকবে, বন্ধ হবে না। সে জন্যই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল 'আমর বিল মারূফ ও নেহী আনিল মোনকার' অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের প্রতিরোধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সর্বোপরি ফেতনা-ফ্যাসাদ ও কুফরীর উৎখাত করে দীন প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

৯. ইসলামের ইতিহাসে যুবক-যুবতীর সোনালী ভূমিকা

ইতিহাসের নায়ক-নায়িকা হচ্ছে যুবক-যুবতী। তারাই ইতিহাস সৃষ্টি করেন। তাদের রেখে যাওয়া ইতিহাস আগামী কালের প্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয় এবং স্মরণীয় বরণীয়। ইসলামের ইতিহাস এ জাতীয় যুব কাহিনীতে পরিপূর্ণ। আমরা এখানে শুধু কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করবো, যেন আমাদের যুব সমাজ পূর্বসূরীদের আদর্শ ও পদাংক অনুসরণ করে পৃথিবীর বুক থেকে তাদের মত অন্যায়-অবিচারের অন্ধকার দূর করে প্রভাতের লাল সূর্যকে দিগন্তে প্রতিষ্ঠিত করেন। কেননা, ইসলাম হচ্ছে আলো আর কুফরী হচ্ছে অন্ধকার। ইসলামের ইতিহাসে অসংখ্য যুবক-যুবতীর কাহিনীর উল্লেখ আছে। আমরা এখানে মাত্র কতিপয় যুবক-যুবতীর দুর্বার ঈমানী শক্তি ও বীর বিক্রমের ইতিহাস তুলে ধরবো।

১. যায়েদ বিন আরকাম

তিনি ছিলেন কনিষ্ঠ যুবক সাহাবী। ৫ম কিংবা ৬ষ্ঠ হিজরীতে মোস্তালেক গোত্রের নেতা হারেস বিন দেরার রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ায় রাসূলুল্লাহ (স) তার বিরুদ্ধে একদল সাহাবাকে নিয়ে জিহাদের উদ্দেশ্যে রওনা হন। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভের লালসায় মোনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাইও সাথে গেল। ঐ জিহাদে মোহাজির জাহজাহর হাতে আনসারী সিনান বিন ওযরা আহত হওয়ায় আনসার ও মুহাজিরের মধ্যে পরস্পর বিরোধী উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। জাহজাহ মোহাজির এবং সিনান আনসারীদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানায়। রাসূলুল্লাহ (স) একে জাহেলিয়াতের আচরণ বলে আখ্যায়িত করেন এবং যালেমের হাত থেকে মযলুমকে রক্ষার আহ্বান জানান। মোহাজির জাহজাহ একটু বাড়াবাড়ি করেছিলেন। ফলে, হযরত ওবাদা বিন সামেত উভয়কে বুঝিয়ে-শুনিয়ে মাফ করিয়ে নিলেন।

আবদুল্লাহ বিন উবাই মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষের সুযোগকে কাজে লাগানোর চেষ্টায় লেগে যায়। সে মুনাফিকদের এক মজলিশে বলেন, মদীনায় গেলে সম্মানী লোকেরা বাহিরাগত বাজে ও অসম্মানিত লোকদেরকে বের করে দেবে। সেই বৈঠকে মু'মিনদের মধ্যে কেবলমাত্র যুবক সাহাবী যায়েদ বিন আরকাম উপস্থিত ছিলেন। তিনি গোটা ঘটনা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলেন। রাসূলুল্লাহ (স) এটাকে অত্যন্ত গুরুতর বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেন। পরে মুনাফিক সরদার উবাই তা অস্বীকার করে। তখনই সূরা 'মুনাফিকুন' নাযিল হয় এবং সাহাবী যায়েদ বিন আরকামের সত্যবাদিতা প্রমাণ করে। আসমান থেকে তাঁর ঈমানের সত্যায়ন হয়।

এ ঘটনার পর মুনাফিক উবাইর মুসলমান পুত্র আবদুল্লাহ নিজ পিতাকে হত্যার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুমতি চান। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে অনুমতি না দেয়ায় তিনি রাস্তায় নিজ পিতার গতিরোধ করেন এবং বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) অনুমতি না দিলে তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (স) এলেন। তিনি দেখলেন যে, মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাই নিজ ছেলে আবদুল্লাহর কাছে বেগতিক বলে যাচ্ছে, আমি তো ছেলেপেলে ও নারীদের চাইতেও অধিক লাঞ্ছিত। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স) পুত্রকে বললেন ঃ তার পথ ছেড়ে দাও, তাকে মদীনায় পৌছতে দাও।

গভীর ঈমান ও দীনের প্রতি একনিষ্ঠ ভালবাসা কাফের পিতাকে অন্যায় আচরণের প্রতি চ্যালেঞ্জ দিতে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করে না। আবার এ ঈমানই 'মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশত' এবং 'মাতা-পিতার জন্য তোমার বাহু

অবনত কর' এ নির্দেশ দেয়। সত্যের সাথে মিথ্যার আপোষ নেই। এ ঘটনা তারই প্রমাণ।

২. প্রখ্যাত সাহাবী সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) বলেন

আমি মুসলমান হওয়ার তিন দিন আগে স্বপ্নে দেখি যে, আমি গভীর অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছি এবং অন্ধকার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি। তখন হঠাৎ আকাশে চাঁদ উঠল এবং আমি তাকে অনুসরণ করলাম। আমি দেখলাম যে, কয়েকজন লোক আমার আগেই সে চাঁদের কাছে পৌঁছে গেছেন। তারা হলেন, যায়েদ বিন হারেসা, আলী বিন আবু তালেব এবং আবু বকর সিদ্দিক। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম আপনারা এখানে কখন এসেছেন ? তাঁরা জবাব দিলেন, আমরা এখনই এসেছি। তারপর যখন রাত কেটে গেল এবং দিন হল, তখন আমি জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ (স) চুপে চুপে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ আমার কল্যাণ চান এবং তিনি আমাকে কুফরীর অন্ধকার থেকে ঈমানের আলোর দিকে নিয়ে যেতে চান। একথা ভেবে আমি দ্রুত তাঁর খেদমতে হাজির হই এবং জিয়াদের গিরি গুহায় তাঁর সাথে গিয়ে সাক্ষাত করি। তিনি তখন আসরের নামায পড়ছিলেন। আমি তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করলাম। আমি স্বপ্নে যাদেরকে দেখেছিলাম তাঁরা ছাড়া আর কেউ আমার আগে সেখানে পৌঁছেনি।

হযরত সা'দ তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন ঃ আমার মা আমার মুসলমান হওয়ার খবর শুনে রাগে ফেটে পড়েন। আমি তার সাথে খুব ভাল ব্যবহার করতাম এবং তাঁকে খুব ভালবাসতাম। তিনি বললেন, হে সা'দ ! তুমি কি ধর্ম গ্রহণ করলে ? এটাতো তোমাকে তোমার মা-বাপের ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আল্লাহর কসম, তুমি এ নতুন ধর্ম ত্যাগ না করলে আমি পানাহার বন্ধ করে দিবো এবং শেষ পর্যন্ত মরে যাবো। আমার শোকে তোমার অন্তর ফেটে যাবে, তোমার কৃতকর্মের জন্য তুমি খুবই লজ্জিত হবে। চিরদিন মানুষ তোমার বদনাম করবে। আমি বললাম, হে আম্মাজান ! আপনি এমন কাজ করতে যাবেন না। আমি কিছুতেই আমার দীন ত্যাগ করবো না। কিন্তু তাঁর মা নিজ সিদ্ধান্তে অটল রইলেন এবং বেশ কিছুদিন যাবত খানা-পিনা বন্ধ করে দুর্বল হয়ে পড়লেন। আমি কিছুক্ষণ পর পরই তাঁর কাছে গিয়ে খাবার গ্রহণের অনুরোধ জানাই। কিন্তু তিনি কঠোরভাবে আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং কসম করে বলতে থাকেন যে, আমি নতুন ধর্ম ত্যাগ করা ছাড়া তিনি কোনো কিছুই খাবেন না।

আমি তাঁকে লক্ষ্য করে বললাম, হে আম্মাজান ! আমি আপনাকে খুব ভালবাসি। কিন্তু আপনার চেয়েও অধিক ভালবাসি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে।

আল্লাহর কসম ! আপনার যদি হাজারটা প্রাণ থাকে আর এ অনাহারের কারণে একটা একটা করে সব প্রাণ বেরিয়ে যেতে থাকে, তবুও আমি আমার এ দীন ত্যাগ করবো না। যখন তিনি আমার এ দৃঢ়তা দেখলেন, তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও পানাহার শুরু করে দিলেন। ঐ সময় আল্লাহ আমাদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ط وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ط - العنكبوت : ٨

"এবং যদি তারা দু'জন (পিতা-মাতা) তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে বাধ্য করে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের দু'জনের আনুগত্য করো না। এবং তাদের দু'জনের সাথে পার্থিব কাজে ভাল ব্যবহার করিও।"–সূরা আনকাবুত ঃ ৮

এ ঘটনায় একজন দৃঢ়চেতা মু'মিন মুসলমানের ঈমানের দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা প্রমাণিত হয়েছে। সর্বাধিক প্রিয় মায়ের কাকুতি-মিনতির প্রথম পর্যায় যখন ব্যর্থ হল, তখন ২য় পর্যায় তিনি অনশন করেন এবং মৃত্যু মুখে উপনীত হন। তা সত্ত্বেও তিনি ঈমানের সাথে এতটুকু আপোষ করেননি।

৩. খালেদ বিন ওয়ালিদ

তিনি বহু জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু শাহাদাত বরণ করতে পারেননি। তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় তিনি আফসোস করে পরিবারের লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ আমি অমুক অমুক বিরাট বিরাট জিহাদে অংশ নিয়েছি। আমার শরীরের কোনো অংশ এমন নেই যা তীর, বল্লম অথবা অন্য কোনো মারাত্মক অস্ত্রাঘাতে যখম হয়নি। কিন্তু অনুতাপের বিষয়, আজ আমি গাধার মত বিছানায় মৃত্যুবরণ করছি। আল্লাহ যেন আমাকে ভীরু-কাপুরুষের প্রাপ্য শাস্তি না দেন। মৃত্যু ভয়ে যারা জিহাদ থেকে দূরে থাকতে চায় তাদেরকে আমার জীবনের এ উপদেশটুকু শুনিয়ে দিও।[১]

মুসলিম যুবক-যুবতীর জন্য এ উপদেশ হোক জীবনের সম্বল।

৪. আবদুল্লাহ বিন হোজাফার চারিত্রিক বীরত্ব

রোম সম্রাট কাইজার জানতে পারলেন যে, তার কারাগারে একজন বুদ্ধিমান মুসলিম যুবক বন্দী আছে। কাইজার আবদুল্লাহ বিন হোজাফার দীন ও ঈমান হরণের পরিকল্পনা নেন। তিনি আবদুল্লাহকে অর্থ-সম্পদ ও সম্মানের

১. মাআরেফুল কুরআন, সূরা বাকারার ২৪৩নং আয়াতের তাফসীর।

লোভ দেখান। তার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের সামনে আবদুল্লাহকে অপমান করা। আবদুল্লাহকে শিকল পরিহিত অবস্থায় হাজির করা হলো কাইজারের দরবারে। কাইজার সিংহাসনে বসা। কাইজার বলেন, হে আবদুল্লাহ ! তুমি খৃষ্টান হয়ে যাও, আমি তোমাকে আমার সাম্রাজ্যের অর্ধেক দিয়ে দেব।' রোম সাম্রাজ্যের অর্ধেকের মালিক হওয়ার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আবদুল্লাহ কি জওয়াব দিতে পারেন ? আবদুল্লাহর অন্তর ছিল ঈমানে পূর্ণ। তাই তিনি জবাব দেন ঃ 'হে আল্লাহর দুশমন ! তোমার ধ্বংস হউক। যদি গোটা দুনিয়াও আমাকে দেয়া হয়, তথাপি আমি আমার দীনের ক্ষুদ্রতম অংশও ত্যাগ করবো না।'

আবদুল্লাহর ঐ জওয়াব শুনে কাইজারের বেগতিক অবস্থা। তিনি তার সেনাবাহিনীকে ডেকে বলেন, আবদুল্লাহকে জেলে নিয়ে যাও। তার শাস্তি বাড়িয়ে দাও, মেরে ব্যথিত করে তোল এবং পুনরায় নিয়ে আস। যেমন হুকুম তেমন কাজ। আবদুল্লাহর উপর অত্যাচার শুরু হলো।

কাইজার নিজ সভাসদের সাথে আবদুল্লাহর ব্যাপারে কি করা যায় তা নিয়ে শলা-পরামর্শ শুরু করেন। তখন তার বড় পরামর্শদাতা খুব মারাত্মক এক প্রস্তাব দেন। তা হচ্ছে, আবদুল্লাহকে যৌন পরীক্ষার সম্মুখীন করা। কেননা, কোনো যুবককে যদি একবার নারীর প্রতি আকৃষ্ট করা যায়, তাহলে তার দীন-দুনিয়া সব শেষ করে দেয়া যায়। তখন সে শুধু আল্লাহর হুকুম থেকেই দূরে সরবে না, বরং আল্লাহর দীনের সাথেও বিদ্রোহ করবে। কাইজার এই প্রস্তাবে রাজী হয় এবং রোমের সর্বাধিক সুন্দরী যুবতীকে হাজির করার আদেশ জারী করে। কাইজার সেই যুবতীকে অর্থের লোভ দেখিয়ে আবদুল্লাহকে অশ্লীল যৌন কাজে লিপ্ত করার জন্য রাজী করে। যুবতীটিকে কারাগারে আবদুল্লাহর কাছে নেয়া হয়। যেহেতু আবদুল্লাহ দীর্ঘ দিন যাবত নিজ পরিবার-পরিজন থেকে দূরে আছে এবং এই যুবতীটি খুবই সুন্দরী তাই আবদুল্লাহ তার প্রতি আকৃষ্ট হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন তার ক্ষতি কে করতে পারে? আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا ۝ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ط

"যে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানে আল্লাহ তার জন্য বাঁচার পথ বের করেন এবং তাকে তার ধারণার বাইরে রিযক দান করেন।"

—সূরা তালাক ঃ ২-৩

সুন্দরী যুবতীটি উলঙ্গ অবস্থায় আবদুল্লাহর কাছে প্রবেশ করে। তখন আবদুল্লাহ কুরআন পড়ছিলেন। তিনি যুবতীর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। কেননা, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এটা হচ্ছে এক বিরাট পরীক্ষা। তিনি

হঠাৎ করে বলে উঠেন, 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন'। আবদুল্লাহ নিজ পায়ের উপর মাথা উপুড় করে পড়ে থাকেন। এদিকে যুবতীটি তাঁর চারদিকে চক্কর দিতে থাকে এবং তাঁকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। কিন্তু সে যখনই আবদুল্লাহর চোখের সামনে যায় তখনই তিনি চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নেন। যুবতীটি আপ্রাণ চেষ্টা করেও আবদুল্লাহকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। তারপর সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, "আল্লাহর কসম, আমি জানি না, তোমরা আমাকে কোন মানুষের কাছে নিয়ে গেছ, না পাথরের কাছে। আল্লাহর কসম ! সে জানে না যে, আমি পুরুষ না মেয়েলোক।"

কাইজারের কাছে তার দ্বিতীয় ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতার খবর পৌছার পর তিনি রাগে জ্বলে-পুড়ে মরতে থাকেন। তিনি পুনরায় নিজ উপদেষ্টাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন এবং বলেন, হে জাতি ! আবদুল্লাহকে বিভ্রান্ত করার আর কি উপায় আছে ? উপদেষ্টারা বলল, মৃত্যুর ভয়ের মাধ্যমে তাকে গোমরাহ করা যাবে। কেননা, সকল মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে। কাইজার বড় ডেগে পানি গরম করার এবং আবদুল্লাহ ও তার প্রিয় সাথীদেরকে হাজির করার নির্দেশ দেন। তার সাথীকে উত্তপ্ত ডেগের পানিতে নিক্ষেপ করা হয়। আবদুল্লাহ সচক্ষে দেখলেন যে, কিভাবে আপন সাথীর শরীর টগবগে গরম পানিতে সিদ্ধ হলো এবং তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। আবদুল্লাহর চোখে পানি নেমে এলো। এবার কাইজার ভাবল, আবদুল্লাহ সম্ভবতঃ ইসলাম ত্যাগ করার চিন্তা করছে। কাইজার প্রশ্ন করলো, হে আবদুল্লাহ ! মৃত্যুর ভয় দেখলে তো ? এরপর তোমার পালা।

আবদুল্লাহ উত্তরে বলেন, "হে আল্লাহর দুশমন ! তুমি ধ্বংস হও। তুমি ভেবেছ যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি। আমি তো শুধু আমার সাথীর করুণ দৃশ্য দেখে কেঁদেছি। কেননা, সে জান্নাতের প্রতিযোগিতায় আমার আগে অগ্রগামী হয়েছে। তার অবস্থা ছিল এ রকম, আমি ২ রাকাত নামায পড়লে সে ৪ রাকাত এবং আমি ৪ রাকাত পড়লে সে ৮ রাকাত পড়ত এবং আমি ২টা রোযা রাখলে সে ৪টা রোযা রাখত। আমার ইচ্ছা ছিল, আমি আখেরাতের প্রতিযোগিতায় তার আগে থাকি। এজন্য আমি কাঁদছি। কেননা, সে আমার আগে আল্লাহ ও জান্নাত পেয়ে গেছে।"

কাইজার নিজের সর্বশেষ ব্যর্থতায় দিশেহারা। তিনি আবদুল্লাহকে বলেন, আমি তোমার বিষয়ে পেরেশান ও অসহায় হয়ে পড়েছি। তোমাকে নিয়ে কি করা যায় ? উত্তরে আবদুল্লাহ বলেন, তুমি আমার দীন পরিবর্তন করতে পারবে না। হতে পারে তুমি আমার দেহের মালিকানা হাতে নিতে পার, কিন্তু আমার রূহের মালিকানা নয়। সেটি আল্লাহর হাতে।[১]

---

১. লিশ শাবাব ফাকাত–আদেল মোহাম্মদ দারুল মানার প্রকাশনী-১৯৯১

৫. প্রখ্যাত সাহাবী আমর বিন জামুহ

তিনি বনি সালামাহ্ গোত্রের সরদার ছিলেন। তিনি ছিলেন মুশরিকদের লাত পূজার অনুসারী। কয়েকবার লাতের উপর আঘাত আসায় লাত তা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

ওহোদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (স) যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করে লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন ঃ

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ○ - ال عمران : ١٣٣

"দৌড়ে চলো তোমাদের রবের ক্ষমার পথে এবং সেই পথে যা আসমান ও যমীনের মত বড় জান্নাতের দিকে চলে গেছে, যা মুত্তাকীদের জন্য তৈরি করেছেন।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৩

তিনি এ আহ্বান শুনে বললেন ঃ 'আল্লাহর কসম, আমি জান্নাতের দিকে ঝাঁপ দেবো।'

তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। কেননা, তিনি খোঁড়া ছিলেন। ওহোদ যুদ্ধের লক্ষ্যে বের হলে তাঁর ছেলেরা বাধা দিল এবং বললো, আল্লাহ্ আপনাকে ওজর দিয়েছেন। তাই জিহাদে যাওয়া ফরয নয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে ছেলেদের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টির অভিযোগ করলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ তাকে তোমরা বাধা দিও না। হতে পারে, আল্লাহ্ তাকে শাহাদাত নসীব করাবেন। তারপর তিনি লড়াই করে শহীদ হয়ে গেলেন।

হাফেজ আজ-জাহাবী তাঁর 'সিয়ার' গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন আবি সা'সা' থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তাঁরা জানতে পেরেছেন যে, বন্যা ওহোদের শহীদ আমর বিন জামুহ ও ইবনে হারামের কবরের মাটি সরিয়ে নিয়ে গেছে। তাদের কবর পরিবর্তনের জন্য পুরাতন কবর খুঁড়ে দেখা গেল, তাদের লাশ অবিকৃত রয়েছে, যেন গতকাল দাফন করা হয়েছে।

একজনের চেহারায় ছিল জখম। দাফনের সময় জখমের উপর হাত রেখেই কবর দেয়া হয়। বন্যার পর যখম থেকে হাত সরিয়ে সোজা করে দিলে রক্ত বের হয় এবং হাত পুনরায় জখমে গিয়ে লেগে যায়। ফলে রক্তক্ষরণও বন্ধ হয়ে যায়। ওহোদ যুদ্ধের ৪৬ বছর পর বন্যার ঘটনা ঘটেছিল। শহীদের লাশ মাটি হজম করতে পারে না। দীন রক্ষায় একজন খোঁড়া-অচল সাহাবীর কি উদগ্র বাসনা, আর কি মর্যাদা ! আমরা কি তাদের উত্তরসূরী ?

৬. ঈমানের দাবী সবকিছুর উর্ধে

ঈমানের দাবী রক্ত-বংশ ও দুনিয়ার যাবতীয় স্বার্থের উর্ধে। নিম্নের ঘটনায় আমরা তাই দেখতে পাই।

তাবরানী ভাল সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন ঃ প্রখ্যাত সাহাবী আবু ওবায়দা (রা) বদর যুদ্ধে নিজ পিতা জাররাহকে হত্যা করে প্রমাণ করেছেন, ঈমানের কাছে কাফের পিতার মূল্য কিছুই নেই।

এছাড়াও মোসআব বিন ওমাইর নিজ কাফের ভাই ওবায়েদ বিন ওমাইরকে হত্যা করেছেন। কুফরীর কারণে ঈমানের কাছে রক্ত সম্পর্ক তথা আপন মায়ের পেটের ভাইকে হত্যা করতে কোনো কষ্ট লাগেনি।

হযরত ওমর বিন খাত্তাব বলিষ্ঠ ঈমানের কারণেই কেবল নিজ মামা আস বিন হেশাম বিন মুগীরাকে এবং হযরত আলী ও হামজা নিজ চাচাত ভাই ওতবা, শায়বা ও ওয়ালিদকে হত্যা করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাদের মত ঈমানদারদের শানেই এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে ঃ

لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْآ اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ - المجادلة : ٢٢

"হে নবী ! আপনি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোনো সম্প্রদায়কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধীদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষাকারী হিসেবে পাবেন না, যদিও ঐ বিরোধী লোকেরা তাদের বাপ, সন্তান, ভাই কিংবা নিজ গোত্রের লোক হোক না কেন।"–সূরা মুজাদালা ঃ ২২

এ জাতীয় ঈমানদাররাই ফাঁসীর মঞ্চেও জীবনের জয় গান গায়। তারা যে কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট, সে কাজে শামা পোকার মত আগুনে ঝাঁপ দেন। মৃত্যু তাদের জন্য ভয়ের কোনো কারণ নয়, বরং জান্নাতের পথের বাধামাত্র। সে বাধা ভেঙ্গে তারা জান্নাতের পথে রওনা হন।

এ জাতীয় ঈমানদার সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ط اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْآ اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّايَفْقَهُوْنَ ○ - الانفال : ٦٥

"হে নবী ! আপনি মু'মিনদেরকে লড়াইর জন্য উৎসাহিত করুন। যদি তোমাদের মধ্যে ২০জন ধৈর্যধারণকারী থাকে, তাহলে তারা ২শ কাফেরের উপর বিজয়ী হবে। আর যদি তোমাদের ১শ লোক থাকে, তাহলে তাদের ১ হাজারের উপর বিজয়ী হবে। কেননা, তারা হচ্ছে, বোকা সম্প্রদায়।"–সূরা আল আনফাল ঃ ৬৫

৭. মুমিনের কাছে দীনের কাজে কিছুই প্রতিবন্ধক নয়

দীনের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং জিহাদের পথে কোনো কিছুই মু'মিনকে বাধা দিতে পারে না। কেননা, ইসলামের স্বার্থ সবকিছুর উর্ধে। সমাজে দীন প্রতিষ্ঠা হল মু'মিনের স্বপ্ন ও জীবনের লক্ষ্য। মু'মিনের কাছে মানুষের হেদায়েত অন্যান্য সকল কিছুর উর্ধে। সাহাবায়ে কেরাম দীনকে এভাবেই বুঝেছিলেন। পরবর্তীতে তাদের অনুসারীদের কাছেও দীনের একই ধারণা বিদ্যমান ছিল। তাঁরা জিহাদ ছাড়া কোনো আন্দোলন বুঝতেন না। পূর্ণাঙ্গ দাওয়াতে দীন ছাড়া তাবলীগ বুঝতেন না এবং ইসলামী জীবনাদর্শ ছাড়া তাদের কোনো লক্ষ্য ছিল না।

এজন্য আমরা ইতিহাসে তাদের ইসলামী দাওয়াতের বিরাট অভিযানের কথা শুনতে পাই এবং আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করার বিশাল প্রচেষ্টার কথা জানতে পারি। আর এজন্য তারা সকল মূল্যবান ও প্রিয় জিনিসের কুরবানী স্বীকার করেছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় শাহাদত কামনা করেছেন।

হযরত ওবাদাহ বিন সামেত (রা) যখন মিসর সম্রাট মোকাওকাস তাকে বিশাল রোমান বাহিনীর সমাবেশের ভয় দেখান এবং টাকা-পয়সার লোভ দেখান তখন তিনি বলেন ঃ হে বাদশাহ ! আপনি নিজে এবং আপনার সঙ্গীগণ সহ আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হবেন না। আপনি যে রোমান বাহিনীর সংখ্যা ও আধিক্যের ভয় দেখাচ্ছেন আমি তাদের ভয় করি না। আমার জীবনের শপথ, আপনি যেগুলোর ভয় দেখাচ্ছেন এবং আমরা যে অবস্থায় আছি তার সাথে এর কোনো সামঞ্জস্য নেই। আপনি যা বলছেন তা যদি ঠিক হয়, তাহলে আমরা দু'টো ভাল জিনিসের যে কোনো একটি লাভ করবো। আমরা আপনাদের উপর বিজয়ী হলে দুনিয়াবী লাভ অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ মালে গনীমত লাভ করবো। আর আপনারা আমাদের উপর বিজয়ী হলে আমরা পরকালের সাফল্য লাভ করবো। জেনে রাখুন, আল্লাহ কুরআন মজীদে বলেছেন ঃ

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

"আল্লাহ্র হুকুমে কম জনবলের অধিকারী বহু দল বেশী সংখ্যার অধিকারী অনেক দলের উপর জয়ী হয়েছে। আল্লাহ ধৈর্য ধারণকারীদের সাথে আছেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৪৯

আমাদের মধ্যে এমন কোনো লোক নেই যে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র কাছে শাহাদত কামনা করে না এবং নিজ শহর, মাতৃভূমি ও সন্তান এবং পরিবারের কাছে ফিরে না যাওয়ার প্রার্থনা জানায় না। আমাদের কারো ফেলে আসা পরিবার ও সন্তানের কোনো চিন্তা নেই। আমাদের প্রত্যেকেই নিজ রবের কাছে আপন আপন পরিবার ও সন্তানকে আমানত রেখে এসেছি। আমাদের প্রধান চিন্তা হল, আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে তাঁর বাণী বুলন্দ করা। আপনি বলেছেন যে, আমাদের অবস্থা করুণ এবং আমরা বহু কষ্টে জীবন যাপন করছি। অথচ আমরা প্রশস্ত জিন্দেগী যাপন করি। গোটা দুনিয়াও যদি আমাদের হয়ে যায় তাহলে আমরা বর্তমানে যে অবস্থায় আছি তার চাইতে বেশী অর্থ ও সুখ আমরা কামনা করবো না।

এই হচ্ছে, আমাদের পূর্বসূরীদের অসংখ্য বীরত্বপূর্ণ ঘটনার একটি মাত্র।

৮. প্রখ্যাত তাবেঈ আবদুল ওয়াহেদ বিন যায়েদের সাথে দুনিয়াতেই হুরের আলাপ

তিনি অত্যন্ত আল্লাহভীরু, ঈমানদার ও নরমদিল ছিলেন। তিনি পরকালের চিন্তায় দুনিয়া বিমুখ ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত আলেম ও ইমাম মালিক বিন দীনারের মজলিশে আখেরাত সম্পর্কিত এক আলোচনা শুনেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে হাশরের ময়দানে একাকী আল্লাহ্র সামনে হাজির হতে হবে এবং জবাবদিহি করতে হবে। একথা শুনার পর তিনি মনে মনে ভাবেন, হাশরের ময়দানে যদি মেহেরবান আল্লাহ একজন ছাড়া সবাইকে বেহেশতে যাওয়ার আহ্বান জানান, তাহলে সে এক ব্যক্তি আমিই হবো। পরকাল সম্পর্কে তাঁর পেরেশানী এতবেশী ছিল।

হারেস বিন ওবায়েদ বলেন ঃ মালেক বিন দীনারের মজলিশে আবদুল ওয়াহেদ আমার পাশে বসতেন এবং ওয়াজ-নসীহত শুনতেন। তাঁর অতিমাত্রায় কান্নার কারণে আমরা মালেক বিন দীনারের বক্তৃতা তেমন একটা শুনতে পেতাম না।

পরবর্তীতে লোকেরা আবদুল ওয়াহেদের মজলিশে জ্ঞান শিক্ষা করত। মজলিশে তাঁর চোখে সর্বদা পানি এসে যেত এবং মজলিশের লোকেরাও আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদত।

মাসমা বিন আসেম বলেন, একদিন মজলিশে আখেরাতের বিষয়ে আবদুল ওয়াহেদের বক্তৃতায় এবং আল্লাহ ও পরকালের ভয়ে ৪ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন। তাদের অন্তরে মরিচা পড়েনি। মরিচা পড়েছে আমাদের অন্তরে।

كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○ - المطففين : ١٤

"কখনও না, তাদের অন্তরে মরিচা লেগেছে তাদের পাপের কারণে।"

–সূরা মোতাফ্ফিফীন ঃ ১৪

এ জাতীয় নেক লোকের প্রতি শুধু পরকালে নয়, দুনিয়ায়ও খোশ খবর রয়েছে। প্রখ্যাত তাবেঈ জালীল বিন হিব্বান আল আসওয়াদ বলেছেন ঃ আবদুল ওয়াহেদ আমাকে বলেছেন ঃ তাঁর পায়ে অসুখ দেখা দিয়েছে। কষ্ট করে তিনি নামায পড়েন ও দাঁড়ান। একদিন তিনি চাদর মাথার নীচে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন এবং দেখেন যে, অন্যান্য কুমারীদের সমভিব্যাহারে এক কুমারী হুর তাঁর কাছে এসেছে। তার সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্য অন্যান্যদেরকে হার মানায়। তারা সবাই তাঁকে ধরে একটা উঁচু বিছানায় রাখেন। তাঁর চারপাশে ইয়াসমিন ফুল ও অন্যান্য সুবাসযুক্ত ফুল ছড়িয়ে দেন। তারপর সেই অপূর্ব সুন্দরী কুমারী তাঁর পায়ে অসুখের স্থানে হাত লাগান এবং বলেন ঃ 'উঠ, নামায পড়, আর কোনো কষ্ট নেই, আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন।'

আবদুল ওয়াহেদ বলেন, আমি ঘুম থেকে জেগে যাই এবং অনুভব করি যেন আমি এখন বাঁধনমুক্ত। ঐ রাত থেকে আর আমার অসুখ নেই এবং কুমারী হুরের কথার আস্বাদ উপভোগ করছি অব্যাহতভাবে।

আল্লাহ তাঁকে আরেকবার পা অবশ করার মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। তিনি আল্লাহর কাছে অযুর সময় অবশ অবস্থা দূর করার ফরিয়াদ জানান। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন। অযুর সময় তিনি নির্দ্বিধায় চলাফেরা করতে পারেন এবং অযু শেষে যখন বিছানায় যান, তখন আবার অবশ অবস্থা ফিরে আসে।[১]

তাবেঈ আবদুল ওয়াহেদের জীবনী হচ্ছে, একজন বেহেশতী লোকের জীবনী। আল্লাহর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে তিনি দুনিয়াতে বসেই বেহেশতের নেয়ামতের নমুনা উপভোগ করেছেন। আমাদের যুবক-যুবতীদের জন্য তাঁর জীবন হোক চমৎকার উদাহরণ।

৯. মিসরের শাসক খাদিও ইসমাঈল

আজ থেকে ১২০ বছর আগে মিসরের শাসক খাদিও ইসমাঈলের শাসনামলে ইথিওপিয়ার উপর প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে মিসরীয় বাহিনী

১. দৈনিক আল মদীনা, জেদ্দা, জুলাই-২০০০

বারবার পর্যুদস্ত হতে থাকে। এজন্য খাদিও ইসমাঈল দুশ্চিন্তায় মগ্ন। তিনি প্রধানমন্ত্রী শরীফ পাশার সাথে এক কাফেলায় চলার সময় নিজেকে হালকা করার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করেন, হে শরীফ পাশা ! আপনি বিপদ দূর করার জন্য কি করেন ? তিনি জওয়াবে বলেন, আমি কিছু খাঁটি আলেমকে দিয়ে বুখারী শরীফ খতম করাই। তাতে আল্লাহ আমার বিপদ দূর করে দেন। এটা শুনে খাদিওর মন নরম হলো। তিনি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর আরুসীর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। বেশ কিছু আলেম মিলে বুখারী শরীফ খতম করা হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও মিসরীয় বাহিনীর পরাজয় অব্যাহত থাকল। তখন খাদিও পুনরায় শরীফ পাশাকে সাথে নিয়ে আল আজহার যান এবং বুখারী শরীফ পাঠকারী ওলামায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনারা যা পাঠ করেছেন তা হয়তো বুখারী শরীফ নয় অথবা আপনারা ভাল আলেম নন। সেজন্য আল্লাহ আপনাদের মাধ্যমে কিংবা আপনাদের খতমের উসিলায় বিপদ দূর করছেন না। আলেমরা চুপ করে রইলেন। সর্বশেষ প্রান্ত থেকে এক আলেম উঠে জবাব দেন, হে ইসমাঈল ! আপনার কারণেই এরূপ হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ "তোমরা হয় সৎকাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখবে। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের উপর তোমাদের সর্ব নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষমতা দেবেন। এরপর তোমাদের নেক ব্যক্তিরা দোয়া করবে কিন্তু তা কবুল হবে না।"

খাদিও একথা শুনে ফিরে গেলেন এবং কোনো মন্তব্য করলেন না। তারপর ঐ আলেমকে তার দরবারে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন দূত পাঠালেন। তিনি দরবারে ঢুকলে খাদিও তাঁকে নিজের সামনে চেয়ারে বসান এবং বলেন, হে শেখ ! আপনি আজহারে যে কথাটি বলেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করুন। শেখ পুনরাবৃত্তি করেন। তখন খাদিও জিজ্ঞেস করেন, আমার কি ক্রটির জন্য বিপদ এসেছে ? শেখ উত্তর দেন, দেশে কি সুদ নেই ? ব্যভিচারের অনুমতি নেই ? মদ ও মাদক দ্রব্য নেই ? নেই কি ইসলাম বিরোধী অগণিত আইন-কানুন ? সরকার এগুলো বন্ধ করার কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তা সত্ত্বেও বুখারী শরীফ পড়ে কি করে বিজয়ের আশা করা যায় ? খাদিও বলেন, আমরা বিদেশীদের সাথে বাস করে তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি। এ ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় আছে ? তখন শেখ বলেন, তাহলে বুখারী শরীফ ও ওলামায়ে কেরামের দোষ দিয়ে লাভ কি ?[১]

এ ঘটনায় লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, (১) ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করা হয়েছে। (২) যুদ্ধে মিসরীয় বাহিনীর প্রধান ছিল একজন খৃস্টান। তিনি

১. আখলাকুল ওলামা–শেখ মোহাম্মদ সোলায়মান–পৃঃ ৯৭।

ইথিওপিয়ার খৃস্টান সরকারকে মিসর সরকারের বহু গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন। ফলে মিসরীয় বাহিনী মার খেয়েছে। (৩) শেখ যা বলেছেন, তাহলো, শরীয়তের বিরোধী আইন চালু এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ না করলে দোয়া কবুল হয় না। মুসলমানের বিপদের সহায় হচ্ছেন আল্লাহ। সেই আল্লাহর কাছেই যদি সাহায্য পাওয়া না যায় তাহলে, তাদের মুক্তি কিভাবে আসবে ? আর সে জন্য তারা সর্বদা লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হবে। যুবক-যুবতীদেরকে দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের সামনে সাহসিকতা ও বলিষ্ঠতার সাথে সত্যকে তুলে ধরতে হবে এবং কারো রক্ত চক্ষুকে ভয় করতে পারবে না। তাহলেই বিভ্রান্ত শাসকগোষ্ঠীর বোধোদয় হবে।

১০. ইমাম হাসানুল বান্না (র)

পুরুষদের মধ্যে আমরা সবশেষে বর্তমান বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের প্রসূতি ইখওয়ানুল মুসলিমুনের প্রতিষ্ঠাতা হাসানুল বান্নার একটি ত্যাগী ভূমিকার উল্লেখ করবো। তিনি প্রত্যেক ঈদে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ও দায়ী'দের সাথে সাক্ষাত করতে যেতেন। এক ঈদে তিনি বের হতে লাগলেন। তার ছেলে সাইফুল ইসলাম ভীষণ অসুস্থ্য। স্ত্রী তাঁকে বলেন ঃ এ ঈদে যদি আপনি আমাদের সাথে থাকতেন তাহলে আমরা আনন্দ পেতাম এবং আপনার অসুস্থ্য ছেলে আপনার সাহচর্য পেত। তাঁর হাতে ছিল সফরের ব্যাগ। তিনি স্ত্রীকে জবাবে বলেন ঃ আল্লাহ যদি আমার ছেলেকে আরোগ্য দান করেন, তাহলে তাঁর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আদায় করবো। আর যদি সে মরে যায় তাহলে তার মৃতদাদা তাকে কবরের সর্বোত্তম ঠিকানা প্রদর্শনকারী। তারপর তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়ে বের হয়ে যান ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآءُ كُمْ وَاَبْنَآؤُ كُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ ○ - التوبة : ٢٤

"হে নবী বলুন, যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ অপেক্ষা তোমাদের বাপ, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, গোত্র, অর্জিত সম্পদ, ব্যবসার মন্দাভাবের আশংকা এবং তোমাদের পসন্দনীয় বাসস্থান অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর হুকুম ও বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।"—সূরা আত তাওবা ২৪

ইসলামী দাওয়াত ও দীন প্রতিষ্ঠার পথে সাধারণত মা-বাপ, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, স্ত্রী, গোত্র, সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সুন্দর বাসস্থান ও বাড়ী-ঘর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ এগুলোর দোহাই ও ওজর দিয়ে দীনের মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দান করা থেকে বিরত থাকে। অথচ আল্লাহর এ নেয়ামত-গুলোর শুকরিয়া আদায় করে এগুলোকে দাওয়াত ও ইকামাতে দীনের সহায়ক শক্তিতে পরিণত করার পরিবর্তে প্রতিবন্ধক শক্তি হিসেবে পরিণত করা হয়। আল্লাহ কি করে তা সহ্য করবেন ? তাই এ আয়াতে তিনি ওজর পেশকারীদেরকে শাস্তির হুমকী দিয়ে বলেছেন, গযব ও শাস্তি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। হাসান বসরীর মতে, এখানে আল্লাহর হুকুম বলতে গযব ও শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে।

পক্ষান্তরে ইমাম হাসানুল বান্না (র)-এর সন্তান দীনের দাওয়াত ও জিহাদ থেকে তাঁকে বিন্দু-বিসর্গও সরাতে পারেনি। একজন বলিষ্ঠ ঈমানদারের মত জবাব দিয়ে তিনি আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। সন্তানের অসুখ ও স্ত্রীর আকুতির কাছে তিনি মাথা নত করেননি।

১১. জা'ফর তাইয়্যার

মূতার যুদ্ধে ৩৩ বছরের বীর যুবক সেনাপতি জাফর তাইয়্যার মাত্র তিন হাজার তাওহিদী সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এক লাখ খৃস্টান সৈন্যের উপর। ডান হাতে তাঁর ইসলামী ঝাণ্ডা। শত্রুর তরবারীর আঘাতে ছিন্ন হয়ে গেল সে হাত। বাম হাতে ঝাণ্ডা তুলে নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন জা'ফর। দুশমনের আঘাতে বাম হাতও ছিন্ন হয়ে গেল। তখন উভয় বাহুকে বুকের সাথে চেপে উঁচু রাখলেন ইসলামী ঝাণ্ডা। এবার দুশমনরা পেছন থেকে তীর নিক্ষেপ করে বুক ভেদ করে দিল তাঁর। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তিনি দাঁত দিয়ে কামড়ে ঝাণ্ডা উঁচু করে রাখলেন। অবনত হতে দিলেন না নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয় ইসলামী ঝাণ্ডা। ইসলামের প্রতি এবং জান্নাত লাভের উদগ্র বাসনা ছাড়া এর আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে ? আজ জা'ফর তাইয়্যারের মত যুবক-যুবতীদের প্রয়োজন সর্বাধিক। নবী করীম (স) তাঁকে বেহেশতের বাগিচায় সবুজ পাখীর অবয়বে উড়তে দেখেছেন।–সিল সিলাতুল আহাদীস আস-সহীহা–নাসেরুদ্দিন আলবানী।

১২. আকাশে গোসলদানকৃত হযরত হানজালা

ওহোদ যুদ্ধে যুবক হানজালা (রা) সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর বাসর শয্যা থেকে জিহাদের দামামা শুনে ফরয গোসল করার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সময় নষ্ট না করে ছুঁটে এলেন ময়দানে। ঝাঁপিয়ে পড়লেন জিহাদে, পান করলেন শাহাদাতের

সুস্বাদু পেয়ালা। ফেরেশতারা আকাশে তাঁর ফরয গোসল দেন। এভাবে মর্তের অধিবাসী স্বর্গের মর্যাদার শীর্ষে আরোহণ করেন।

১৩. আলী (রা)

তিনি ছিলেন ঈমান, আমল ও তাকওয়ার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা দৃষ্টান্তের মর্যাদা লাভ করেছে। বীর কেশরী যুবক আলী মৃত্যুর সকল সম্ভাবনা নিয়ে হিজরতের রাতে মহানবীর পরিবর্তে তাঁর বিছানায় শুয়ে রইলেন এবং কাফেরদেরকে ধোঁকায় ফেলে দেন। খায়বারের যুদ্ধে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে তিনি বিজয় ছিনিয়ে আনেন।

❐ এবার আমরা এমন কিছু মু'মিন যুবতীর ঘটনা উল্লেখ করবো যা আমাদের সমাজের যুবতীদের জন্য বিশেষভাবে এবং যুবকদের জন্য সাধারণভাবে প্রেরণা এবং অনুকরণের উৎস হিসেবে কাজ করবে।

১. আছিয়া বিনতে মোযাহেম

তিনি ছিলেন মিসরের যালেম ও আল্লাহদ্রোহী শাসক ফেরআউনের স্ত্রী। পবিত্র কুরআন মজীদ তাঁর গভীর ঈমান, আমল ও তাকওয়ার প্রশংসা করেছে। আল্লাহ একাধিক সূরায় এ মহিয়সী মহিলার প্রশংসা করেছেন। তিনি ফেরআউনের কাছ থেকে আল্লাহর প্রতি ঈমান গোপন রেখেছিলেন। একজন বাদশাহর স্ত্রীর পক্ষে রাজকীয় পরিবেশে ঈমান গোপন রেখে চলা চাট্টিখানা কথা নয়।

এক পর্যায়ে ফেরআউন তাঁর ঈমান সম্পর্কে টের পেয়ে যায় এবং অহংকারে ফেটে পড়ে জিজ্ঞেস করে, আমি ছাড়া কি অন্য কোনো উপাস্য আছে? আছিয়া জওয়াব দেন, অবশ্যই আছে। তিনি হচ্ছেন আমার ও তোমার রব যিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর দিকেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। যালেম ফেরআউন একথা শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে এবং তাঁকে মানসিকভাবে কষ্ট দেয়ার জন্য তাঁর সামনে সন্তানদেরকে হত্যা করে। তার আশা যে, এর ফলে ভীত হয়ে আছিয়া তার প্রতি ঈমান আনবে। এতে যখন কাজ হল না, তখন ফেরআউন হতাশ হয়ে অন্যান্য বদমাশ লোকদেরকে তাঁর উপর শারিরিক নির্যাতনের নির্দেশ দেয়। তাঁর উপর নেমে আসে অত্যাচারের স্টীম রোলার। প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে জান্নাতে নিজের ঘরের প্রতি নজর পড়ায় তিনি হেসে উঠেন। ফেরআউন ঠাট্টা করে বলে, আমরা তাকে কঠোর শাস্তি দিচ্ছি আর সে হাসছে। সে কতইনা বেকুফ ! ঈমানের পথে নিজের জান কুরবানী দিয়ে হযরত আছিয়া সকল মু'মিন মুসলমানের জন্য অনুকরণীয় হয়ে আছেন।

২. আসমা বিনতে আবু বকর

তিনি হলেন, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকার বড় বোন। তাঁকে 'জাতুন নেতাকাইন' বলা হয়। 'নেতাক' মানে কোমর বন্ধনী। অর্থাৎ দুই কোমর বন্ধনী বিশিষ্টা মহিলা। রাসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর পিতা আবু বকর সিদ্দিক হিজরতের সময় যখন সাওর গুহায় অবস্থান করেন তখন তিনি তাদের জন্য প্রেরিত খাদ্যদ্রব্য ও পানির মশক বাঁধার জন্য কোমর বন্ধনীকে মাঝ বরাবর ফাড়েন এবং অর্ধেক দিয়ে তা বেঁধে দেন। সে জন্য তিনি পরবর্তীতে 'দুই কোমর বন্ধনী মহিলা' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিষয়টি নগণ্য মনে হলেও ঈমান, আন্তরিকতা ও এখলাসের প্রাচুর্যের কারণে ঐ ক্ষুদ্র সেবাটুকুও ইসলামের ইতিহাসে এক মহান খেদমত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের ছিলেন তাঁর সুযোগ্য সন্তান। মারওয়ান বিন আবদুল মালেক ছিলেন ইসলামী খেলাফত বিচ্যুত শাসক। তাই আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। লোকেরা তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। একই সময়ে মুসলমানদের দুই খলিফা। মারওয়ান আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। দীর্ঘ ৭ মাস ব্যাপী যুদ্ধে ইবনে যোবায়েরের বাহিনী মক্কায় ক্রমান্বয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়েন। এদিকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নেতৃত্বাধীন মারওয়ানের বাহিনীর কাছে প্রতিদিন দামেস্ক থেকে সাহায্য ও সরবরাহ পৌছতে থাকে।

এমতাবস্থায় একদিন ইবনে যোবায়ের মসজিদে হারামে ইবাদাতে মগ্ন অবস্থায় নিজ মায়ের কাছে এসে সন্ধির প্রস্তাব দেয়ার ব্যাপারে পরামর্শ করেন। উত্তরে তাঁর মা বলেন ঃ

"বেটা আমি কেবল একটা কথাই জানি। তাহচ্ছে, সম্মানের সাথে মৃত্যু অপমানের মুকুট পরা অপেক্ষা উত্তম। তুমি আগে তোমার কর্তব্য জেনে নাও। আমি প্রতি মুহূর্তে দোয়া করছি, তোমার সাহস ও হিম্মত অটুট থাকুক এবং তোমার মনোবল যেন কখনও ভেঙ্গে না পড়ে। জীবনে সংকট তো কতই আসবে-যাবে।

মায়ের এ বিশাল অনুপ্রেরণা ও সাহস নিয়ে তিনি ফিরে যান এবং মারওয়ানের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। এদিকে তাঁর বাহিনীর লোকেরা ধোঁকা ও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তাঁর আনুগত্য থেকে সরে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় ইবনে যোবায়ের মায়ের অসুখের খবর পেলেন। তিনি মায়ের কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, আম্মা শরীর-স্বাস্থ্য কেমন ? মা জবাব দেন,

শরীরটা যেন জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে। ভীষণ জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভব করছি। ইবনে যোবায়ের অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর ব্যাপারে ভেবে-চিন্তে বললেন, আম্মা ! এ দুনিয়ায় শান্তি কোথায় ? মা বলেন, সে তো ঠিকই বেটা, কিন্তু আমি দিন-রাত দোয়া করছি যে, ভাল হয়ে যাবো। আমি এখন মরতে চাই না। আমার আকাঙ্ক্ষা এটাই যে, তুমি লড়াই করে শহীদ হবে এবং আমি ধৈর্য ধারণ করবো। অথবা তুমি সফল হবে এবং আমার চোখ শীতল হবে। তারপর আমি মৃত্যুবরণ করবো।"—উসুদুল গাবা

ইবনে যোবায়ের মায়ের অনুপ্রেরণা ও নির্দেশকে সামনে রেখে ফিরে আসেন এবং প্রাণপণ যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যান। জীবিত নয় বরং তাঁর মৃত লাশই মায়ের কাছে ফিরে আসে।

হাজ্জাজ কয়েকদিন পর্যন্ত ইবনে যোবায়েরের লাশ ঝুলিয়ে রাখেন এবং হযরত আসমার কাছে এসে বলেন ঃ দেখলেন তো আমি আল্লাহর দুশমনের কি অবস্থা করি ? উত্তরে আসমা বলেন ঃ 'তুমি তার দুনিয়া নষ্ট করেছ আর সে তোমার আখেরাত নষ্ট করেছে।'—মুসলিম

এ ঘটনার এক সপ্তাহ পর হযরত আসমা ইন্তেকাল করেন। কেমন জিন্দাদিল মু'মিন হলে নিজের কলিজার টুকরা-সন্তানকে শাহাদাতের আগ পর্যন্ত লড়াই করতে বলতে পারেন। যা অন্যান্য মায়েদের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। হযরত ওমর (রা) তাঁকে বার্ষিক এক হাজার দীনার ভাতা দিতেন। তিনি এগুলো সহ পুত্রের দেয়া সকল অর্থ-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় বিতরণ করে দিতেন। হায়, আজ যদি দুনিয়ায় এ রকম মা থাকত !

৩. সুমাইয়া

তিনি উম্মে আম্মার নামে বেশী খ্যাত। তাঁর স্বামীর নাম ইয়াসির। ঈমান আনার কারণে মক্কার কাফেররা ইয়াসির পরিবারের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। প্রখর রোদের মাঝে উত্তপ্ত বালুর উপর তাদেরকে শুইয়ে দিত। এভাবে পুরো দিন কেটে যেত। তাদেরকে রাত্রে ঘরে ফিরার সুযোগ দিয়ে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য চাপ দিত। এভাবে কষ্ট ও নির্যাতনের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে দেয়া হল। সুহায়েব, বেলাল এবং খাব্বাবেরও এই একই অবস্থা ছিল। শেষ পর্যন্ত কাফেররা স্বামী ইয়াসিরকে শহীদ করল এবং সুমাইয়াকে দু' উটের সাথে বেঁধে উট দু'টোকে দু' দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে অত্যন্ত নির্মম ও পৈশাচিকভাবে তাঁকে শহীদ করল। এভাবে তিনি দ্বিখণ্ডিত হয়ে শহীদ হয়ে যান। তথাপি কুফরী বাক্য মুখ দিয়ে উচ্চারণ এবং অত্যাচারের মুখে ঈমান

পরিবর্তন করতে রাজী হননি। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, কাফেররা তাঁর লজ্জাস্থানে তীর নিক্ষেপ করে তাঁকে শহীদ করে। হায় আল্লাহ ! এ যুগেও ঈমানের অগ্নি পরীক্ষায় মুসলিম যুবক-যুবতীদেরকে হাসিমুখে জীবন দেয়ার তাওফীক দিন।

৪. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ৯ বছর বয়সে দাম্পত্য জীবন শুরু করেন এবং মাত্র ৯ বছর দাম্পত্য জীবন যাপনের পর বিধবা হন। এ নয় বছরে তিনি মহানবীর যুবতী স্ত্রী হিসেবে তাঁর আমল ও ইলম-এর যথার্থ উত্তরাধিকারিণী হতে পেরেছেন। কচি বয়সে স্মৃতিশক্তি বেশী থাকায় তিনি বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কাছে হাদীস ও তাফসীর শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত আবু মূসা আশআরী বলেন ঃ তাঁকে কঠিন মাসআলাসমূহ জিজ্ঞেস করে উত্তর না পেয়ে আমি কখনও ফিরে আসিনি।

ইমাম জোহরী বলেন ঃ হযরত আয়েশা (রা) বিরাট আলেম ছিলেন। বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করেছেন। সকল নারী-পুরুষের জ্ঞান একত্রিত করলেও হযরত আয়েশা (রা)-এর জ্ঞান আরো বেশী হবে।

বর্তমান যুগের যুবক-যুবতীরা নবী পত্নী যুবতী আয়েশা (রা)-এর পাণ্ডিত্য সহ অন্যান্য গুণ-বৈশিষ্ট্য অর্জন করে মুসলিম মিল্লাতের সৃষ্ট শূন্যতা পূরণ করতে পারেন।

৫. উম্মে সোলাইম (রা)

তাঁর প্রথম স্বামীর নাম মালিক আবু নসর। উম্মে সোলাইম রাসূলুল্লাহ (স)-এর খালা হন। উম্মে সোলাইম মুসলমান হওয়ায় তাঁর স্বামী রাগে-ক্ষোভে ও অভিমানে এ আশায় দেশ ত্যাগ করে যে, হয়তো স্বামীর ভালবাসার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তিনি ইসলাম ত্যাগ করবেন। তিনি তো ইসলাম ত্যাগ করেননি। কিন্তু ইতিমধ্যে বিদেশে মালিক আবু নসর মৃত্যুবরণ করে। হযরত আনাস ঐ ঘরের সন্তান। তারপর হযরত আবু তালহা তাঁর কাছে বিয়ের পয়গাম পাঠান। তিনি মুসলমান ছিলেন না। ফলে তিনি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন ঃ হে আবু তালহা ! তুমি কি জান, অমুক গোত্রের দাস তোমাদের ঐ মাবুদগুলোকে তৈরি করেছে ? যদি তোমরা তাতে আগুন লাগিয়ে দাও, সেগুলো পুড়ে যাবে। আনাস বলেন ঃ আবু তালহা ফিরে গেলেন এবং

একথাগুলো তার মনে দাগ কাটল। তারপর তিনি উম্মে সোলাইমের কাছে এসে বলেন, তুমি আমাকে যে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছ আমি তা গ্রহণ করলাম। এরপর দু'জনের মধ্যে বিয়ে হয়। আনাস বলেন, আবু তালহার ইসলামই ছিল উম্মে সোলাইমের দেন-মোহর।

একবার তাঁর এক ছেলের মৃত্যু হয়। আবু তালহা রাত্রে সফর থেকে বাড়ী ফিরে এসে ছেলে কেমন আছে তা জানতে চাইলেন। উম্মে সোলাইম বলেন ঃ 'ভাল আছে ও ঘুমিয়ে আছে।' তিনি বেশী কিছু বলে সফরাগত স্বামীকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করতে চাননি। রাত্রে যথারীতি স্বামীর সেবা ও দাবী পূরণ করেন। সকালে স্বামীকে বলেন ঃ আপনার নিকট কারো কোনো কিছু আমানত থাকলে সে তা ফেরত নিলে আপনার কোনো আপত্তি আছে ? আবু তালহা বললেন ঃ না। উম্মে সোলাইম বলেন ঃ আল্লাহ আমাদেরকে একটি পুত্র আমানত দিয়েছিলেন, তিনি তাকে নিয়ে গেছেন। সে জন্য আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। আবু তালহা মৃত্যুর সংবাদ দেরীতে পেয়ে ব্যথিত হয়েছিলেন।

উম্মে সোলাইমের কতবেশী ধৈর্য, আল্লাহর উপর ভরসা, স্বামী ভক্তি ও আদর্শ গৃহিণী ছিলেন এ ঘটনা তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

৬. উম্মে আম্মারা (রা)

তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী যোদ্ধা। ওহোদ যুদ্ধে তিনি শত্রুদের হাত থেকে নবী করীম (স)-কে রক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকেন। তিনি ঢাল দিয়ে অশ্বারোহী কাফের সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করতেন এবং ফিরে যাওয়ার সময় তিনি তাদের ঘোড়ার পা কেটে দিতেন।

ওহোদ যুদ্ধে তাঁর দু' ছেলে নবী (স)-এর প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন। আঘাতের ফলে ছেলের হাত থেকে অনবরত রক্ত ঝরতে থাকায় নবী (স) উম্মে আম্মারাকে ব্যাণ্ডেজ করে দেয়ার নির্দেশ দেন। ব্যাণ্ডেজ শেষে তিনি ছেলেকে আদেশ দিলেন, যাও কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর।

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর ভূমিকায় সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্য দোয়া করেন। তখন তিনি বলেন, আমার জন্য দোয়া করেন যেন, জান্নাতে আপনার সাথে থাকতে পারি। রাসূলুল্লাহ (স) দোয়া করলে তিনি বলেন, আর কোনো পরোয়া নেই, এখন দুনিয়ার যে কোনো বিপদ সহ্য করতে পারবো। তাঁর ছেলে হাবিব বিন জায়েদকে মিথ্যা নবী মোসায়লামা কাজ্জাব কঠোরভাবে নির্যাতন করে এবং তার প্রতিটি অঙ্গ আলাদা আলাদা করে কেটে তাকে হত্যা করে। হযরত আবু বকর খালেদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে চার হাজার সৈন্যের এক বাহিনী

ইয়ামামা পাঠান। উম্মে আম্মারা ছেলের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বার্ধক্যের দুর্বলতাকে উপেক্ষা করে তাদের সফর সঙ্গী হন এবং শত্রুর আঘাতে তার একটি হাত খসে পড়ে। যুদ্ধে মোসাইলামা কাজ্জাব নিহত হন।

৭. হামনা বিনতে জাহাশ

মহিলা সাহাবীরা বিপদ-মুসীবতে দীনের স্বার্থে বিরাট ধৈর্য ও ত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন।

ওহোদ যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে হামনাহ বিনতে জাহাশ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে রাস্তায় দেখা করেন। নবী (স) তাঁকে তাঁর ভাই আবদুল্লাহ বিন জাহাশের শাহাদতের খবর দেন। তিনি ইন্নালিল্লাহ পড়ে তার গুনাহ মাফ চান। তারপর তাঁর মামা হামজাহ বিন আবদুল মুত্তালিবের শাহাদতের খবর দেন। এবারও তিনি ইন্নালিল্লাহ পড়ে গুনাহ মাফ চান। সবশেষে তাঁর স্বামী মোসআব বিন ওমাইরের শাহাদতের খবর দেন। তিনি তিন শহীদের শাহাদতের বিনিময়ে সওয়াব লাভ করার লক্ষ্যে চরম ধৈর্য ধারণ করেন। দীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে এরূপ গুণবতী নারী এক অমূল্য সম্পদ।

৮. এক ধৈর্যশীলা নারী

নবী (স) ওহোদ যুদ্ধ শেষে বনি দীনার গোত্রের এক মহিলার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সাহাবায়ে কেরাম তাকে যুদ্ধে তার স্বামী, ভাই ও বাপের শাহাদতের খবর দিলে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কুশল জিজ্ঞেস করেন। তাঁরা বলেন ঃ আল্লাহর রহমতে, আপনার আগ্রহ মোতাবেক তিনি ভাল আছেন। মহিলাটি বললেন ঃ আমাকে নবী (স) কে দেখান। তাঁকে দেখার পর মহিলাটি বলল ঃ

كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ

"আপনার কুশলের পর সকল মুসীবত আমার জন্য তুচ্ছ।"

এ রকম এক মহতী ও মুজাহিদ নারী লক্ষ্য-কোটি মানুষ অপেক্ষা উত্তম। চোখে-মুখে তাঁর ঈমানের দীপ্তি।

৯. সা'দ বিন মোআজের মা

আরেক আদর্শ ধৈর্যশীলা মা হলেন হযরত সা'দ বিন মোআজের মা। তিনি ঘোড়ার পিঠে দ্রুত চড়ে নবী (স)-এর কাছে আসেন এবং সা'দ (রা) ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকেন। সা'দ বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, তিনি আমার 'মা'। নবী (স) বলেন ঃ 'স্বাগতম'। তিনি তাঁর জন্যে উঠে দাঁড়ান। সাদের মা তাঁর

নিকটবর্তী হলে তিনি যুদ্ধে তার সন্তান আমর বিন মোআজের শাহাদতের জন্য শোক প্রকাশ করেন। সাদ-এর মা বলেন ঃ 'হে আল্লাহর নবী! আপনাকে সুস্থ দেখে আমার বিপদ ছোট অনুভূত হচ্ছে।'

সাধারণ কোনো মহিলা হলে, তিনি শহীদ তো দূরের কথা, এক শহীদের খবরেই শোকে-দুঃখে বেঁহুশ হয়ে যেত। একমাত্র ঈমানের বলিষ্ঠ প্রাচীর সাগরের মত বিশাল শোকের ঢেউয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে এবং সাগর থেকে কাঁচা মণি-মুক্তা কুড়ানোর সুযোগ এনে দিয়েছে। আজ দরকার সে রকম মা-বোনের।

১০. হযরত খানসা (রা)

তিনিও ছিলেন একাধারে এক আদর্শ মা, যোদ্ধা ও কবি। নিজের ৪ ছেলে সহ তিনি কাদেসিয়ার যুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি যুদ্ধে নিজ ছেলেদেরকে এক ঐতিহাসিক উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই উপদেশের ভিত্তিতে যুদ্ধ করে ৪ ছেলেই শহীদ না হওয়া পর্যন্ত বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। তিনি সন্তানদের শাহাদাতের কথা শুনে বলেন, সন্তানদের শাহাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহর রহমতে আমিও তাদের সাথে থাকতে পারবো। তিনি নিজ সন্তানদেরকে এ বলে উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ "হে প্রিয় ছেলেরা ! তোমরা স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করেছ ও হিজরত করেছ। এছাড়া দেশ ছাড়ার আর কোনো কারণ ছিল না। আল্লাহর কসম ! তোমরা এক পিতা-মাতার সন্তান। আমি তোমাদের পিতার সাথে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং তোমাদের মায়ের নামেও কলংক করিনি। হে ছেলেরা ! তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, দুনিয়া একদিন ধ্বংস হবে আর সত্যের শত্রুদের সাথে জিহাদ করা বিরাট সওয়াবের কাজ। তোমাদের মনে রাখা উচিত, দুনিয়ার জীবনের চাইতে পরকালের জীবন অনেক বেশী উত্তম। আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ ! বিপদে ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ কর এবং সবর কর। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাক। তাহলে, তোমরা সাফল্যলাভ করতে পারবে।" হে পুত্রগণ ! একথাগুলো মনে রেখে কাল যুদ্ধে যোগ দেবে, আল্লাহর সাহায্য চাইবে এবং শত্রুর সাথে লড়াই করবে। যুদ্ধ তীব্র হলে শত্রুর নেতাকে আক্রমণ করবে। ইনশাআল্লাহ সম্মানের সাথে বেহেশতে যেতে পারবে।"

১১. দুই যুবতী কন্যার চিঠি

মোহাম্মদ বিন সোয়েদ তাহ্হান বর্ণনা করেন। আমরা হাফেজে হাদীস আসেম বিন আলীর কাছে ছিলাম। আমাদের সাথে ছিলেন আবু ওবায়েদ এবং ইবরাহীম বিন আবুল লাইস সহ একদল লোক। ঐ সময় খলীফা মো'তাসেম

'কুরআন সৃষ্ট' এ মতবাদের বিরোধিতা করায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালাতে থাকেন এবং তাকে বেত্রাঘাত করতে থাকেন। তখন আসেম বলেন ঃ আমি এ বিষয়ে খলীফার সাথে আলাপ করতে যেতে চাই। আমার সাথে কে কে যাবে ? ইবরাহীম বিন আবুল লাইস বলেন ঃ আমি আপনার সাথে যাবো।

এদিকে ওয়াসেতে বসবাসকারিণী আসেমের দু' মেয়ের এক চিঠি এসেছে তার কাছে। চিঠিতে তারা লিখেছেন, আমরা জানতে পেরেছি, খলীফা মো'তাসেম 'কুরআন সৃষ্ট' এ মতবাদের সমর্থন না করায় ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে মারছেন। সুতরাং আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং মো'তাসেমের ইচ্ছা পূরণে সাড়া দেবেন না। তার ইচ্ছা পূরণ অপেক্ষা আমাদের কাছে আপনার মৃত্যুর খবর অধিকতর প্রিয়।[১]

দু'জন যুবতী কন্যার ঈমান কত গভীর ছিল যে, নিজেদের পিতার মত এত বিশাল জ্ঞানী আলেমকে পর্যন্ত তারা সম্ভাব্য ভ্রান্তির বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন।

১২. স্ত্রীর মুখ খোলার বিরুদ্ধে স্বামীর অভিমানের পুরস্কার

খতীব বাগদাদী এক স্ত্রীলোকের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। স্ত্রীলোকটি ২৮৬ হিজরী সালে 'রাই' শহরে কাজী মূসা বিন ইসহাকের কাছে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। মহিলাটির প্রতিনিধি কাজীকে বলেন ঃ তার মক্কেল স্বামীর কাছে ৫শ দীনার দেনমোহর বাবত পাবে। কিন্তু তার স্বামী তা আদায় করছে না। স্বামী এ দাবী অস্বীকার করেন। কাজী সাক্ষী তলব করেন। প্রতিনিধি বলেন, হ্যাঁ, সাক্ষীরা হাজির। একজন সাক্ষী মহিলাটিকে চিহ্নিত করে সাক্ষ্য দেয়ার উদ্দেশ্যে তার মুখের পর্দা সরাতে বলেন। প্রতিনিধি মহিলাটিকে মুখ খুলে দাঁড়াতে বলেন। স্বামী বলল ঃ আপনারা একি করছেন ? প্রতিনিধি বলেন ঃ সাক্ষ্যের জন্য মুখ খোলা জরুরী। স্বামী বলেন ঃ তার মুখ খোলার দরকার নেই। কাজী সাহেব সাক্ষী থাকুন, আমার কাছে তার ৫শ দীনার মোহর পাওনা আছে। আমি তা পরিশোধ করবো। তার মুখ খোলার দরকার নেই। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকটি বলল, আমি কাজী সাহেবকে সাক্ষী করে বলছি, আমি আমার প্রাপ্য মোহর মাফ করে দিলাম এবং তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে তা থেকে জিম্মা মুক্ত করলাম।

এ ঘটনাটি পড়ে মু'মিন মুসলমানদের সম্বিত ফিরে আসা উচিত। আজ বাস্তবে কি চলছে ? আমরা প্রতি মুহূর্তে টেলিভিশনের পর্দায়, বাজার, রাস্তাঘাট,

---

১. তারীখে বাগদাদ ও সিয়ার আ'লাম আননোবালা।

যানবাহন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস-আদালতে কত উলঙ্গ ও অর্ধোলঙ্গ মহিলাদেরকে দেখি। অথচ তাদের স্বামী-বাপ ও ভাইদের কোনো অভিমান নেই। উল্টো স্বামীরা চায় যেন তাদের স্ত্রী ও কন্যারা সুন্দর ও আঁটসাট পোশাকে সজ্জিত হয়ে ঘরের বাইরে বের হোক এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবের সামনে হাজির হোক। বন্ধু-বান্ধবরা তাদের সৌন্দর্যের প্রশংসা করুক।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। বুখারী শরীফের এক হাদীসে মহানবী (স) বলেছেন ঃ

صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمْ قَوْمٌ مَعَهُمْ سَيَاطٌ كَاَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلاَتٌ مُمِيْلاَتٌ رُؤُسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَيَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَاَنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا ـ

"আমি দু ধরনের জাহান্নামী লোককে দেখিনি। [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর আমলে তাদের অস্তিত্ব দেখা যায়নি। পরে তাদের অস্তিত্ব দেখা দেবে।]

(১) এক সম্প্রদায়ের হাতে গরুর লেজের মত লম্বা বেত, যা দিয়ে তারা লোকদেরকে মারে। (অর্থাৎ অত্যাচারী লোক)

(২) কাপড় পরিধানকারিণী স্ত্রীলোক অথচ উলঙ্গ হেলেদুলে চলতে অভ্যস্ত এবং অন্যদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্টকারিণী। তাদের উন্মুক্ত মাথায় উটের কুজের মত উঁচু খোঁপা বেঁধে ঠাকঠমকে চলে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং এর ঘ্রাণ পর্যন্ত পাবে না অথচ এত এত .... দূর থেকে এর ঘ্রাণ পাওয়া যায়।"–মুসলিম

এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্যতম মো'যেজা। তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন তা বর্তমান যুগে পুরো মাত্রায় বিদ্যমান। তারা শরীরের কিছু অংশ কাপড় দিয়ে ঢাকে আর অবশিষ্টাংশ খোলা ও উলঙ্গ রাখে। অথবা এমন পাতলা কাপড় পরে যে, ভেতরে শরীরের চামড়া পর্যন্ত দেখা যায় কিংবা এত আঁটসাট পোশাক পরে যে, শরীরের বিপজ্জনক স্থানগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে। তারা বেপর্দা মহিলা। মাথায় বড় করে খোঁপা বাঁধে যেন তা উটের কুজ। কিন্তু কাপড় দিয়ে ঢাকে না। তারা শালীনভাবে চলার পরিবর্তে হেলেদুলে চলে এবং অন্য পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা মুসলমান হলেও জাহান্নামী। আমাদের সমাজের যুবতীদের হেদায়েত এবং পর্দার জন্য এ হাদীসটি কি যথেষ্ট নয়?

১৩. রাবেআহ আদাওইয়াহ

আরেক মহীয়সী মহিলা ছিলেন রাবেআহ আদাওইয়াহ। ইবশিহী সহ আমাদের পূর্বসুরী ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন, তিনি দিনে ও রাতে ১ হাজার রাকাত নামায পড়তেন। তাঁকে এতবেশী নামায পড়ার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন ঃ আমি শুধু এ কারণে ১ হাজার রাকাত নামায পড়ি, যেন নবী (স) তাঁর অন্যান্য ভাই-আম্বিয়ায়ে কেরামের কাছে এ বলে গর্ব করতে পারেন যে, দেখুন, আমার উম্মতের এ নারী দিনে-রাতে ১ হাজার রাকাত নামায পড়ে।

কি অপূর্ব অভিমানী এ নারী ! নিজের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমী ইবাদাতের মাধ্যমে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মান বৃদ্ধির জন্য উৎসাহী। কোনো পুরুষ কি তা পারবে ? কোনো নারী বা পুরুষ দিনে কি ৫শ রাকাত বা ৩শ রাকাত বা একশ রাকাত নামায পড়তে পারে ? আমরা তা দেখি না।

অবশ্যই এ মহিলার নারীত্ব আমাদের মত পুরুষদের পুরুষত্বকে ধিক্কার দেয়।

আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মোহাম্মাদ (স) পর্যন্ত এমন সব মহীয়সী যুবতী মোত্তাকী ও মুজাহিদ মহিলা আছেন যারা যুগে যুগে সকল মহিলার জন্য অনুকরণীয়। তাদের একজন হলেন নবী ঈসা (আ)-এর মা হযরত মরিয়ম। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ কুরআন মজীদে বলেছেন ঃ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى। "পুরুষরাও সে মহিলার মত (এত মর্যাদাবান) নন।" এ রকম যুবতী মহিলাই আজকের সমাজের বড় প্রয়োজন।

১০. চার ময়দানের সংশোধনে যুব সমাজের চিরন্তন কর্মপদ্ধতি

সকল সংশোধন-সংস্কার ও পরিবর্তনের দায়-দায়িত্ব যুবক-যুবতীর উপর। সত্যিকার সুখী মুসলিম সমাজ গড়তে হলে ব্যক্তি জীবন ও সামষ্টিক জীবনের আমুল পরিবর্তন দরকার। পরিবর্তন এমনিতেই আসে না এবং তা স্বয়ংক্রিয়ও নয়। শক্তি প্রয়োগ ও সমন্বিত চেষ্টার মাধ্যমেই পরিবর্তন আসে। ছোট একটি কাঁটাও রাস্তা থেকে এমনিতে সরে যায় না। তাকে সরাতে হয়। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুঞ্জীভূত অন্ধকার, গোমরাহী, ভ্রান্তি, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, শিরক ও বেদআত এমনিতেই দূরীভূত হবে না। তাকে দাওয়াত ও তাবলীগের এবং ইকামাতে

দীনের বিশুদ্ধ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে দূর করতে হবে। পরিবর্তনের জন্য প্রেষণা, আগ্রহ ও দরদী মানসিকতা চাই। আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَايُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ط - الرعد : ١١

"আল্লাহ্ কোনো জাতির ভাগ্য সে পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না জাতি নিজের ভাগ্য নিজে পরিবর্তন করে।"—সূরা আর রা'দ ঃ ১১

আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের ফলে মুসলমানরা তাদের হারানো ইজ্জত-সম্মান, শৌর্য-বীর্য ও শক্তি ফিরে পাবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ ○

"ইজ্জত-সম্মান কেবলমাত্র আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।"—সূরা মুনাফেকুন ঃ ৮

ইসলামের সুফল ও কল্যাণের ফল্গুধারা লাভ করতে হলে ৪ ময়দানের সংস্কার অত্যাবশ্যক। যুব সমাজকেই সেই পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিতে হবে। সে ৪ ময়দান হল ঃ

১. ব্যক্তির সংশোধন, ২. পরিবারের সংশোধন, ৩. সমাজ সংশোধন ও ৪. রাষ্ট্রের সংশোধন।

এক. ব্যক্তির সংশোধন

ব্যক্তির সংশোধন ছাড়া পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সংশোধন সম্ভব নয়। পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তির সংশোধন হচ্ছে নিউক্লিয়াস। ব্যক্তি হচ্ছে ইঞ্জিন আর সমাজ হচ্ছে তার দেহ। ব্যক্তি ও পরিবার সংশোধনের লক্ষ্যে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও, যার জ্বালানী হল মানুষ ও পাথর।"
—সূরা আত তাহরীম ঃ ৬

ব্যক্তির সংশোধনের জন্য তিনটি বিষয়ের সংশোধন জরুরী। সেগুলো হল ঃ ১. ঈমান-আকীদা, ২. ইলম বা জ্ঞান এবং ৩. আমল।

১. **ঈমান-আকীদা** ঃ তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের উপর গতানুগতিক নয়, বুঝে-শুনে যথার্থ ঈমান আনতে হবে। আর সাথে সাথে শিরক, বেদআ'ত ও কুসংস্কার থেকে দূরে থাকতে হবে। ঈমানের দাবী হল তাকওয়া অর্জন করা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আজাবকে ভয় করে তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। ফরয, ওয়াজিব ও হালাল-হারাম মেনে চলতে হবে। কালেমা গ্রহণের ও বাস্তবায়নের পর মু'মিনের জীবনে বহু গুণাবলীর সমাবেশ ঘটে। এটাকেই কুরআন মজীদ 'কালেমা তাইয়্যেবাহ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ কালেমা তাইয়্যেবার উদাহরণ এভাবে দিয়েছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ ۝ تُؤْتِىْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ط

"তুমি কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ কেমন উদাহরণ বর্ণনা করেছেন ? কালেমা তাইয়্যেবা বা পবিত্র বাক্য হল, পবিত্র গাছের মত। তার শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত ও মজবুত, আর শাখা আকাশে প্রসারিত ও ফুলে-ফলে সুশোভিত।"–সূরা ইবরাহীম ২৪-২৫

হাদীসে এ গাছের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে তা হচ্ছে, খেজুর গাছ।

"হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কুরআনে উল্লেখিত পবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ আর অপবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে হানযাল বা মাকাল বৃক্ষ।"–তিরমিজী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকেম।

খেজুর গাছ দ্বারা মু'মিনের উদাহরণ দেয়ার প্রথম কারণ হলো, কালেমায়ে তাইয়্যেবার মধ্যে ঈমান হচ্ছে মজবুত ও অনড় শিকড় বিশিষ্ট, দুনিয়ার বিপদাপদ একে টলাতে পারে না। সাহাবী থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত এমন খাঁটি মু'মিনের সংখ্যা কম নয়। ২য় কারণ হল, তাদের পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা। তারা দুনিয়ার নোংরামী থেকে সর্বদা দূরে থাকেন। মাটির আবর্জনা উঁচু বৃক্ষকে স্পর্শ করতে পারে না। ৩য় কারণ হল, ঈমানের ফলাফল অর্থাৎ নেক আমল খেজুর গাছের শাখার মত উর্ধাকাশের দিকে ধাবমান। আল্লাহ বলেন ঃ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ 'ভাল কালেমা, নেক আমল ও ইবাদাত প্রতিদিন সকাল-বিকেল আল্লাহর্‌র দরবারে পৌঁছে।' ৪র্থ কারণ হল, খেজুর গাছের প্রতিটি অংশই উপকারী। তেমনি মু'মিনের প্রতিটি কথা ও কাজ, উঠা-বসা ইত্যাদিও ফলদায়ক।[১]

---

১. মাআরেফুল কুরআন–সূরা ইবরাহীমের ২৪-২৫ আয়াতের তাফসীর।

শিরক ও কুফর হচ্ছে ঈমানের পরিপন্থী। নেফাক হচ্ছে এমন জঘন্য কাজ যার অনুসারীরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবেন। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ -

"মুনাফিকগণ জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে স্থান পাবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৪৫

বেদআতপন্থীরাও ইসলামের সীমা বহির্ভূত। হাদীসে সকল বেদআতকে জাহান্নামপন্থী আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ঈমানের মূল কথা হলো কালেমা, "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, নেই আনুগত্য লাভকারী, আদেশ- নিষেধ ও আইনদানকারী অন্য কোনো সত্তা। ব্যক্তি জীবন থেকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল বিধান ও আইন মহাগ্রন্থ আল কুরআন এবং মহানবীর হাদীস থেকেই গ্রহণ করতে হবে। মানব রচিত কোনো আদর্শ ও মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ قف - ال عمران : ١٩

"আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দীন বা জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম।"
–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَلْاِيمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ -

"ঈমানের ৭৩-৭৯টি শাখা আছে। এর মধ্যে সর্বোত্তম শাখাটি হচ্ছে কালেমা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সর্বনিম্ন শাখাটি হচ্ছে, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা।"–বুখারী, মুসলিম

ঈমান-আকীদার অনুসারীরা হন ভদ্র, শালীন, উপকারী, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও আচরণের অধিকারী, জ্ঞানী-গুণী এবং উত্তম চরিত্রবান। অন্যরা ভাল মু'মিনকে দেখে নিশ্চিত হয় যে, তার দ্বারা কোনো ক্ষতি হবে না, বরং উপকার হবে। মহানবী (স) বলেছেন ঃ

لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِى الْاِسْلَامِ -

"ইসলামে ঠকাও যাবে না এবং ঠকানোও যাবে না।"–আবু দাউদ

তিনি আরও বলেছেন ঃ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ۔

"মুসলমান সে যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ।"-মেশকাত

২. **ইলম বা জ্ঞান ঃ** দীন সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান, বিশেষ করে ফরয-ওয়াজিব ও হালাল-হারাম সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করা ফরয। ফরয সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ফরয, আর সুন্নত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন সুন্নত। এটাই হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের ইসলামী মূলনীতি। এর কম জ্ঞান অর্জনের কোনো সুযোগ নেই। সেজন্য ইসলামে অজ্ঞতা হারাম এবং জ্ঞান অর্জন করা ফরয। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ۔

"প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয।"–ইবনে মাজাহ

জ্ঞানের মর্যাদা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ কুরআনে বলেছেন ঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ۔ فاطر : ٢٨

"আল্লাহকে তাঁর জ্ঞানী-আলেম বান্দারাই ভয় করে।"

–সূরা ফাতের ঃ ২৮

তিনি জ্ঞানী ও মূর্খের সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ধারণ করে বলেছেন ঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ ط ۔ الزمر : ٩

"আপনি বলুন, যারা জ্ঞানী আর যারা জ্ঞানী নয়, তারা এক সমান নয়।"

–সূরা যুমার ঃ ৯

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔

"মূর্খ আবেদের উপর আলেমের ফযীলত হল, পূর্ণিমার রাত সকল তারকার উপর চাঁদের আলোর মতো।"–আবু দাউদ, ইবনু মাযাহ, ইবনু হিব্বান

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلَى اَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ

اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَاَهْلُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى النَّمْلَةَ فِىْ جُحْرِهَا وَحَتّٰى الْحُوْتِ فِى الْبَحْرِ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِى النَّاسِ الْخَيْرَ ـ

"মূর্খ আবেদের উপর আলেমের ফযীলত হচ্ছে তোমাদের নিম্নতম ব্যক্তির উপর আমার মর্যাদার মতো। নিশ্চয়ই আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমান ও জমীনের অধিবাসী এমনকি গর্তের পিঁপড়া ও সাগরের মাছ পর্যন্ত সেই শিক্ষকের উপর রহমত ও মাগফেরাতের দোয়া করেন, যিনি মানুষকে ভাল জিনিস শিক্ষা দেন।"–তিরমিজী

এ হাদীসে ইল্‌ম চর্চা ও শিক্ষাদান উভয়ের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যারা ইল্‌ম অর্জনের বিষয়ে আগ্রহী নয়, কিংবা বিরোধিতা করে কিন্তু আমল-ইবাদাত করে, তাদের সেই ইবাদাতের মর্যাদা আলেমের আমলের তুলনায় খুবই কম।

দীনি জ্ঞানের উৎস হচ্ছে কুরআন ও হাদীস। রাসূলুল্লাহ (স) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন ঃ আমি তোমাদের জন্য দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমরা এ দু'টোকে আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত গোমরাহ হবে না। সে দু'টো জিনিস হল, আল্লাহর কিতাব ও আমার হাদীস।"–আল আহাদীস আস সহীহাহ নং ১৭৬১, নাসেরুদ্দিন আলবানী।

কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ ج فِيْهِ ج هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ لا ـ البقرة : ٢

"এ কিতাবে কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই ; এটা মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত ও পথপ্রদর্শক।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২

বুঝা গেল, মু'মিন-মুত্তাকী হতে হলে এ কুরআন থেকে হেদায়েত ও পথের দিশা নিতে হবে। সেজন্যই কুরআন পড়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর কার্যক্রম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্রে তোমাদের জন্য রয়েছে অনুসরণের জন্য অনুপম আদর্শ।"–সূরা আল আহযাব ঃ ২১

তাঁর জীবনাদর্শ জানার জন্য হাদীস পড়া প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন ঃ

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج - الحشر :7

"রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।"–সূরা হাশর ঃ ৭

এ আয়াতে মহানবীর কথা, কাজ ও সমর্থনকে গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এর অপর নামই হাদীস বা সুন্নাহ।

মহানবী (স) বলেছেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ -

"আমার এবং সঠিক পথের অনুসারী খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত অনুসরণ করা তোমাদের জন্য জরুরী।"–আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান।

জ্ঞান অন্বেষণকারী জান্নাতের সহজ পথের সন্ধান পায় এবং আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাত লাভ করে। আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ইল্‌ম অর্জনের উদ্দেশ্যে পথ চলবে, তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেবেন।

আর যখন একদল লোক আল্লাহর ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং শিক্ষামূলক আলাপ-আলোচনা করে, তখন তাদের উপর আল্লাহর তরফ হতে মহা প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে রাখে, আর ফেরেশতারা তাদের মজলিশকে ঘিরে রাখেন এবং স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফেরেশতাদের মজলিশে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন। যার আমল তাকে পেছনের দিকে টানবে, বংশ-গৌরব তাকে বাড়াতে পারবে না।"–মুসলিম

রাসূলুল্লাহ (স) জ্ঞান অর্জনকে দীনি কল্যাণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। হযরত মুআওইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ -

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনি জ্ঞান দান করেন।"

–বুখারী, মুসলিম

দীনের কল্যাণ লাভ করার জন্য কুরআনের তাফসীর, হাদীস, ইসলামী সাহিত্য, ফেকাহ, তাওহীদ, আকায়েদ ও ইসলামের ইতিহাস পড়া দরকার।

জ্ঞানহীন ব্যক্তি পশুর সমান। বিশেষ করে পরকালের সাফল্য ও ব্যর্থতার প্রশ্ন যেখানে জড়িত সেখানে দীনি ইলেমের বিকল্প কিছু নেই। প্রত্যেককে দীন সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করতেই হবে।

৩. আমল ঃ আমল অর্থ কাজ। মানুষ যা বিশ্বাস করে, সে অনুযায়ী তাকে কাজ করতে হয়। কৃষককে চাষাবাদ করতে হয়, শ্রমিককে গতরে খেটে কাম-াই করতে হয় এবং ডাক্তারকে রোগীর চিকিৎসা করতে হয়। এভাবে প্রত্যেক পেশার লোক নিজ নিজ কাজ ও পেশায় নেশাগ্রস্ত থাকে। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পেশার প্রতি বিশ্বাসী ও আস্থাবান।

বিশ্বাস ও কর্ম অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। তাই ইসলামী চিন্তাবিদ, ওলামায়ে কেরাম ও ইমামগণের দৃষ্টিতে ৩টি পর্যায় ঈমান অর্থপূর্ণ হয়।

১. মুখের স্বীকৃতি ২. অন্তরের বিশ্বাস ও ৩. কাজের মাধ্যমে বিশ্বাসের বাস্তবায়ন। ঈমান বা বিশ্বাসের বাস্তবায়নকেই আমল বলা হয়।

তাই আমল ছাড়া ঈমান হতে পারে না। আল্লাহর প্রতিটি আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নামই আমল। কুরআন ও হাদীসের বহু জায়গায় আমলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সকল ইবাদাত, ফরয-ওয়াজিব, নফল-সুন্নত সহ সকল ভাল উপকারী কাজই নেক আমল।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ج وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ز ـ الجاثيه : ١٥

"যে নেক আমল করবে সে তা নিজের জন্য পাবে। আর যে পাপ করবে, এর বোঝা তার উপরই বর্তাবে।"–সূরা আল জাসিয়াহ ঃ ১৫

আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۝ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝ ـ العصر

"সকল মানুষ ধ্বংসের মধ্যে আছে, শুধুমাত্র তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, নেক কাজ করেছে এবং পরস্পর সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।"–সূরা আসর

আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط

"আপনি বলুন, তোমরা আমল কর, শীঘ্রই আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ তা দেখবেন।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১০৫

আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ج

"হাশরের দিন সকল প্রাণ তার সমস্ত নেক কাজের ফল পাবে।"
–সূরা আলে ইমরান ঃ ৩০

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ ـ

"যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, আমরা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৫৭

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

فَالْيَوْمَ لَاتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

"আজ (হাশরের দিন) কোনো ব্যক্তির উপর বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না এবং তোমাদের আমল ছাড়া প্রতিদানের আর কোনো ব্যবস্থা নেই।"
–সূরা ইয়াসিন ঃ ৫৪

আমলহীন জ্ঞান ফলবিহীন গাছের মতো। ফল না দিলে সে গাছের দাম খুবই নগণ্য।

আমল বলতে ফরয-ওয়াজিব অবশ্যই পালন করতে হবে। সুন্নতে মুআককাদাও পালনীয় বিষয়। সুন্নতে যায়েদা, মোস্তাহাব বা নফল ইবাদাত দ্বারা ফরয-ওয়াজিবের ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষতি পূরণ হয়। এগুলোর মাধ্যমে বান্দাহ আল্লাহর অধিকতর নিকটবর্তী হয়।

আবু হুরাইরা (রা). থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اَحْبَبْتُهُ وَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا ـ

"আমার বান্দাহ যেসব আমল দ্বারা আমার নৈকট্যলাভ করে তার মধ্যে এ আমলটিই আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় যা আমি তার উপর ফরয করেছি। আমার বান্দাহ বরাবরই নফল ইবাদাত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। অবশেষে সে আমার অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠে। যখন সে আমার প্রিয় হয়ে যায়, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনতে পায়। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে পথ চলে।"–বুখারী

সমাজ সেবামূলক কাজ নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত। তাই যে যতবেশী সমাজ সেবামূলক কাজ করবে, সেটা তার নেক আমলের মধ্যে যোগ হবে। এমনকি গাছ লাগালে যদি তাতে ফল ধরে এবং মানুষ ও পাখী তা খায় তাহলে সদকার সওয়াব পাবে। এক তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়ে এক বেশ্যা গুনাহ্ মাফ পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। রাস্তা থেকে কাঁটা ও কষ্টদায়ক জিনিস সরানো এবং হাসিমুখে কথা বলা, সদকার অন্তর্ভুক্ত। রোগী দেখা, কোনো মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করা এবং কারো মনে খুশীর সঞ্চার করা নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত। আবদুল্লাহ বিন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

"যে কোনো মুসলমানের দুঃখ-দুর্দশা দূর করবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার অনুরূপ দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দেবেন।"–বুখারী, মুসলিম

অবসর বসে না থেকে সময় ও শক্তির ব্যবহার করা উচিত। হয় মানুষকে দীনের দাওয়াত দেয়া, না হয় সৎ উপদেশ দেয়া, কিংবা কাউকে দীনি কোনো মাসয়ালা-মাসায়েল এবং তাজবীদ শিক্ষা দেয়া, পরোপকার করা, সমাজ সেবা, দান করা, নফল নামায, রোযা ও কুরআন তেলাওয়াত কিংবা জ্ঞান চর্চা করা উচিত। এগুলো সবই নেক আমল।

গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সদ্ব্যবহার

ব্যক্তির সংশোধনের সাথে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সদ্ব্যবহার অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। মূলত ব্যক্তি হচ্ছে ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই সমষ্টি। আল্লাহ পাপ কাজের জন্য বেশ কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে দায়ী করেছেন। সেগুলোর সদ্ব্যবহার না করলে মু'মিন আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা পাবে না। আল্লাহ হাত, পা, মুখ, চোখ, কান, পেট ও লজ্জাস্থানকে পাপের জন্য দায়ী করেছেন। তাই তিনি হাশরের বিচারের দিনে মুখে তালা লাগিয়ে দেবেন এবং হাত, পা, কান, চোখ

ও চামড়ার স্বাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। মানুষ অন্যকে ফাঁকি দিলেও নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কিভাবে ফাঁকি দেবে ? সময় থাকতে সাবধান হতে হবে।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○ - يس : ٦٥

"আজ আমি তাদের মুখে তালা লাগিয়ে দেবো, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং পা স্বাক্ষ্য দেবে তারা যে সকল পাপ কাজ করেছে সে সম্পর্কে।"–সূরা ইয়াসিন ঃ ৬৫

এ আয়াতে মুখের কথা বন্ধ করে হাতকে মুখের ভূমিকায় এবং পাকে স্বাক্ষীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করা হবে। মুখ হয়তো মিথ্যা বলতে পারে। কিন্তু হাত ও পা একদিনই কথা বলবে এবং সত্য কথা বলবে।

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ○ حَتّٰى اِذَا مَاجَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ط قَالُوْا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْ اَنْطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

"যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে আগুনের দিকে ঠেলে নেয়া হবে এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌছবে, তখন তাদের কান, চোখ ও চামড়া তাদের কাজ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তারা তাদের চামড়াকে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন ? তারা বলবে, যে আল্লাহ্ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে। তোমাদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের চামড়া তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না–এ ধারণার কারণে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না।

তবে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না।"–সূরা হা-মীম আস্ সাজদাহ ঃ ১৯-২২

এ আয়াতে কান, চোখ ও চামড়া পাপ কাজে সাক্ষ্য দেবে বলে উল্লেখ এসেছে। এ দু' আয়াত দ্বারা মুখের বিরুদ্ধে অন্য ৫টি অঙ্গের সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হল, হাত, পা, কান, চোখ ও চামড়া।

এখন আমরা ঐ সকল গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সদ্ব্যবহারের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করবো। যুবক-যুবতীদের উচিত, এগুলোর সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করা।

১. আত্মা ও হৃদয় ঃ আত্মা থেকেই আত্মশুদ্ধির ধারণা এসেছে। একে কুরআনের পরিভাষায় 'তাজকিয়ায়ে নফস' বলা হয়। আত্মা বা হৃদয় সকল কাজের উৎস। নিয়ত ছাড়া কোনো আমল কবুল হয় না। এজন্য মানুষকে নিয়ত করে নেক কাজ করতে হয়। অন্তরই হচ্ছে নিয়তের কেন্দ্র। হযরত ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَانَوٰى ـ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ ـ

"সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তি যা নিয়ত করবে, তাই পাবে। যার হিজরতের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকেই হবে। আর যার হিজরতের উদ্দেশ্য হল, দুনিয়া লাভ করা কিংবা কোনো স্ত্রীলোককে বিয়ে করা, তার হিজরত সে দিকেই হবে।"–বুখারী, মুসলিম

হাদীসে সকল আমলকে নিয়তের উপর নির্ভরশীল বলা হয়েছে। আর বিরাট কাজ হচ্ছে হৃদয়ের।

ব্যক্তির সকল নেক কাজের প্রধান লক্ষ্য হল, আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধি সাফল্য ও ব্যর্থতার মাপকাঠি। যার আত্মশুদ্ধি হয়নি তার সকল ইবাদাত ও সৎকাজ ব্যর্থ। একথাই আল্লাহ বলেছেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝ ـ الشمس : ٩ـ١٠

"যে আত্মশুদ্ধি করতে পেরেছে সে সফল হয়েছে এবং যে তাকে কলুষিত করেছে, সে ব্যর্থ হয়েছে।"–সূরা আশ-শামস ঃ ৯-১০

আমরা প্রতি মুহূর্তেই হৃদয় দিয়ে কিছু না কিছু চিন্তা করি। আর এ ভিত্তিতেই জগতের সকল কাজ-কর্ম আঞ্জাম দেই। প্রতি পাঁচ মিনিটে গড়ে কমপক্ষে ১টি বিষয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে এক ঘণ্টায় ১২টি এবং এক দিনে ২১৬টি চিন্তা করি। অবশ্য ঘুমের জন্য ৬ ঘণ্টা সময় বাদ দিয়ে বাকী ১৮ ঘণ্টার হিসেবে এ পরিসংখ্যান দাঁড় করানো হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা আল্লাহর জন্য কয়টা চিন্তা করি ? গর্ভের একাশিতম দিবসে সন্তানের হৃদযন্ত্র কাজ শুরু করে এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। এমনকি রূহ চলে যাওয়ার পরও কৃত্রিম উপায়ে কিছু সময় পর্যন্ত হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া চালু রাখা যায়। শরীরের এ অঙ্গটিই কেবলমাত্র যতক্ষণ পর্যন্ত কাজ করে, নিষ্ঠার সাথে কাজ করে। অবিরাম গতিতে ও অক্লান্তভাবে হৃদযন্ত্রের এ ক্রিয়া আল্লাহর বিরাট সৃষ্টি রহস্য। হৃদযন্ত্রের কাজের পরিমাণ বুঝা যায় শিশুর ভূমিষ্ঠ হবার পর প্রতি মিনিটে ১৪০ বার পর্যন্ত শিরা চলাচলের মাধ্যমে। তারপর তা হ্রাস পেয়ে বয়স্কদের বেলায় প্রতি মিনিটে ৭৬ বারে এসে দাঁড়ায়। যেমন কোনো লোকের বয়স ১শ বছর হলে তার হৃদযন্ত্রের নড়াচড়ার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৫শ কোটি বার। হৃদযন্ত্র প্রতি মিনিটে সারা শরীরের ধমনীতে পাম্প করে ৬ লিটার বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহ করে। এ হিসেবের ভিত্তিতে দেখা যায়, তা দৈনিক ৮ হাজার ৬৪০ লিটার রক্ত বিশুদ্ধ করে সরবরাহ করে এবং মাঝারী ধরনের বয়সের লোকের জীবনে দেড় থেকে আড়াই লাখ টন রক্ত পাম্প করে। বুকের বামপাশে এ পাম্পিংয়ের নড়াচড়া অনুভব করা যায়।

সুবহানাল্লাহ ! এ ছোট একটি হৃদযন্ত্রের এত বিরাট কর্মক্ষমতা ! তা যদি পাম্প বন্ধ করে দেয়, তখনই মৃত্যু অনিবার্য। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে বা হার্ট ফেল করে কত লোক অহরহ মারা যাচ্ছে। জিনিসটি ক্ষুদ্র, অথচ তার ক্ষমতা কত বেশী। হৃদয় হচ্ছে, শরীরের কেন্দ্র। তেমনি আমলেরও কেন্দ্রবিন্দু। তাই ইসলাম এ কেন্দ্রটিকে সংশোধনের উপর অত্যধিক জোর দিয়েছে। মহানবী (স) বলেছেন ঃ

اَلاَ وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ ـ

"সাবধান ! শরীরের মধ্যে এক টুকরো গোশত এমন আছে যা ঠিক ও সংশোধন হলে, গোটা শরীর ঠিক ও সংশোধিত থাকে এবং তা খারাপ হলে, গোটা শরীর খারাপ হয়ে যায়। সাবধান ! সেটি হচ্ছে, অন্তর।"
—বুখারী, মুসলিম

অন্তর দু' প্রকার। এক ধরনের অন্তর হচ্ছে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের জন্য নিবেদিত। এটাকে নফসে লাওয়ামা বা মুতমায়িন্না বলে। অর্থাৎ ভাল প্রবৃত্তি। আরেক ধরনের অন্তর হচ্ছে, অসুস্থ। এ ধরনের অন্তর নেক ও দীনি কাজে অনিচ্ছুক। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ বলছেন ঃ

فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ـ البقرة : ١٠

"তাদের অন্তরে রোগ আছে। আল্লাহ সে রোগকে আরো বাড়িয়ে দেন।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ১০

এটাকে নফসে আম্মারা বা কুপ্রবৃত্তিও বলা হয়।

মহানবী (স) এ কুপ্রবৃত্তি থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়ে নেক প্রবৃত্তির জন্য দোয়া করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلَى دِيْنِكَ

"হে অন্তর পরিবর্তনকারী ! আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দাও।"–তিরমিজী, ইবনে মাজাহ

হৃদয় শরীরের কত গুরুত্বপূর্ণ অংশ তা লোকমান হাকীমের নিম্নোক্ত কাহিনী দ্বারা আরো বেশী পরিষ্কার হবে। তিনি তাঁর চাকরকে একটি ভেড়া জবেহ করে এর দু'টো সর্বোৎকৃষ্ট টুকরো নিয়ে আসার আদেশ দেন। চাকর ভেড়া জবেহ করে এর হার্ট ও জিহ্বা নিয়ে এল। ২য় দিন তিনি চাকরকে আরেকটি ভেড়া জবেহ করে এর নিকৃষ্টতম দু'টো টুকরো নিয়ে আসার আদেশ দেন। চাকর ভেড়া জবেহ করে এবারও হার্ট ও জিহ্বা নিয়ে হাজির হল। লোকমান হাকীম আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তুমি হার্ট ও জিহ্বাকে একবার সর্বোৎকৃষ্ট, আবার নিকৃষ্টতম হিসেবে পেশ করার কারণ কি ? চাকর জবাব দিল ঃ 'এ দু'টো টুকরো ভাল হলে সর্বোৎকৃষ্ট হয় আর খারাপ হলে নিকৃষ্টতম হয়।'

শরীরের আর কোনো অঙ্গের এত গুরুত্ব নেই। সৎ নিয়ত ও সৎ চিন্তা সৎকাজের ভিত্তি। যার অন্তর যত বেশী সৎ ও জ্ঞানী-গুণী সে ততবড় নেককার। ভাল পরিবেশে এবং ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করলে মন সৎ হতে পারে। যারা খারাপ পরিবেশে কিংবা সাহচর্যে কাটায়, তাদের মনে সৎ চিন্তা কমই আসে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অন্তরকে নেক আমলের ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করা যায়। ইঞ্জিন ঠিকমত চললে অন্যান্য অঙ্গগুলোও ঠিকমত কাজ করবে।

অন্তরের কঠোরতা ঃ অন্তর কঠোর হলে, নেক কাজে মন বসে না এবং দীনি কাজের প্রতি আগ্রহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় না, খারাপ কাজ ভাল লাগে। মনের এ অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে বলেন ঃ

كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○ - المطففين : ١٤

"কখনও না, বরং তাদের অন্তরে তাদের পাপের ও কৃতকর্মের কারণে মরিচা পড়েছে।"–সূরা মুতাফ্‌ফিফীন ঃ ১৪

মন কঠোর হওয়ার কারণগুলো হচ্ছে ঃ

১. বেশী কথা বলা এবং আল্লাহর জিকর না করা।

২. আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা। আল্লাহ বলেন ঃ

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قَاسِيَةً -

"তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে আমি তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ১৩

৩. বেশী হাসা। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

لاَ تُكْثِرُ الضَّحْكِ ، فَاِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ -

"তোমরা বেশী হেসো না। অধিক হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে।"–ইবনে মাজাহ, বায়হাকী।

৪. বেশী খাওয়া,

৫. বেশী ঘুমানো,

৬. বেশী গুনাহ করা। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةُ سَوْدَاءُ فِىْ قَلْبِهِ ، فَاِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صَقَلَ قَلْبُهُ وَاِنْ زَادَا زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبُهُ فَذٰلِكَ الرَّانُ الَّذِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ -

"মু'মিন যখন গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে কাল দাগ পড়ে। যদি সে তাওবা করে, গুনাহ থেকে দূরে থাকে ও গুনাহ মাফ চায়, তার অন্তরের ময়লা ও মরিচা দূর হয়। সে তাওবা এস্তেগফার যত বেশী করবে, তার

অন্তর তত উন্নত হবে। এটাই কুরআনের উপরোল্লিখিত আয়াতে মরিচা পড়ার ব্যাখ্যা।"

আমরা অন্তর কঠোর হওয়া এবং মরিচা পড়ার কারণগুলো জানলাম। এখন অন্তরের কঠোরতা ও মরিচা দূর করার উপায় নিয়ে আলোচনা করবো।

অন্তরের কঠোরতা দূর করার উপায়

১. বেশী বেশী আল্লাহর জিকর করা। আল্লাহকে বেশী স্মরণ করতে হবে। কুরআন পাঠ, হাদীস পাঠ, ইসলামী সাহিত্য পাঠ, ফেকাহ-আকায়েদ পাঠ, জ্ঞান শিক্ষাদান, নামায পড়া ইত্যাদি সকল ইবাদাত জিকরের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন দোয়া-দরুদ পড়াও জিকরের অন্তর্ভুক্ত।

২. ইয়াতিম মিসকীনের প্রতি দয়া-সহানুভূতি প্রদর্শন ঃ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে এসে অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ করল। তখন নবী (স) বলেন ঃ

اِنْ اَحْبَبْتَ اَنْ يَّلِيْنَ قَلْبُكَ فَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ وَاَطْعِمِ الْمَسْكِيْنِ۔

"তুমি যদি অন্তরকে নরম করতে চাও, তাহলে ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকীনকে খাবার দাও।"–মুসনাদে আহমদ

৩. মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتْ "তোমরা স্বাদ ও ভোগ বিধ্বংসী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর।"

৪. বেশী বেশী কবর যেয়ারত করা ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْاٰخِرَةَ۔

"আমি তোমাদেরকে কবর যেয়ারত সম্পর্কে নিষেধ করতাম। এখন কবর যেয়ারতের আদেশ করছি। কবর যেয়ারত আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।"–আহমদ, তিরমিজী

৫. মনের ব্যাধি যেমন, হিংসা-বিদ্বেষ লোক দেখানো, মুনাফেকী ও গর্ব-অহংকার ইত্যাদি থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখতে হবে।

যে কোনো ইবাদাতের জন্য সুস্থ্য ও বিশুদ্ধ মন দরকার। আল্লাহ ভাল মনের প্রশংসা করে বলেছেন ঃ

يَوْمَ لَايَنْفَعُ مَالٌ وَّلَابَنُوْنَ ۙ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝ - الشعراء : ٨٨

"হাশরের দিন অর্থ-সম্পদ কোনো কাজে আসবে না। কেবলমাত্র যে ব্যক্তি সুস্থ মন নিয়ে আসে, তাই কাজে আসবে।"–সূরা শো'আরা ঃ ৮৮-৮৯

২. পেট ঃ আল্লাহ হালাল আয়-রোজগারকে ফরয এবং হারাম উপার্জনকে নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি মানুষ যেন হালাল খায় এবং পেটে যেন কোনো হারাম জিনিস না ঢুকায়, তার কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰۤئِثَ - الاعراف : ١٥٧

"তিনি পবিত্র জিনিসকে হালাল এবং অপবিত্র জিনিসকে হারাম করেছেন।"
–সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৫৭

চুরি-ডাকাতি, সুদ-ঘুষ, জুয়া, মিথ্যা ও জালিয়াতির মাধ্যমে উপার্জন, ওজনে কম দেয়া, ভেজাল মিশানো, ধোঁকা-প্রতারণা করে কামাই করা, ফাঁকি দেয়া, খাজনা-ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া, নকল জিনিসকে খাঁটি জিনিস হিসেবে চালিয়ে দেয়া ইত্যাদির মাধ্যমে উপার্জন হারাম। অন্যায় ও বাতিল উপায়ে অন্যের অর্থ আত্মসাত করাও হারাম। হারাম জিনিস খেয়ে ইবাদাত করলে সে ইবাদাত কবুল হবে না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَارَبِّ يَارَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ -

"তারপর রাসূলুল্লাহ (স) এমন এক মুসাফিরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন যিনি দূর দেশ থেকে এসেছেন, যার চুল ধূলা-মলিন ও এলোকেশী, তিনি আকাশ পানে দু' হাত তুলে দোয়া করেন এবং বলেন, হে রব ! হে রব ! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম এবং হারামের উপর ভিত্তি করেই তিনি গড়ে উঠেছেন। তার দোয়া কিভাবে কবুল হবে ?"
–মুসলিম

হাদীসের মর্ম হচ্ছে, লোকটি বেশী ইবাদাত গুজার। দূর দূরান্ত থেকে পবিত্র স্থান সফরে এসেছেন দোয়া ও ইবাদাতের জন্য। কিন্তু যার খাদ্য, পানীয় ও পোশাক হারাম আয়ের, তিনি হারাম খেয়েই শরীরের রক্ত মাংস তৈরি করেছেন। আল্লাহ তার ইবাদাত কবুল করবেন না।

আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ

وَلاَ تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ - البقرة : ١٨٨

"তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের অর্থ আত্মসাত করো না।"

ভাবার বিষয় হল, দিনে দুই বেলা খাবার ও দুই বেলা নাশ্তা এবং ফলমূল সহ যদি কমপক্ষে আধা কেজি পরিমাণ ভাত, মাছ, গোশত, তরি-তরকারি, ফলমূল ও শাক-সব্জি, মিষ্টি ইত্যাদি পেটে ঢুকে, তাহলে মাসে ১৫ কেজি, বছরে ১৮০ কেজি এবং ৭০ বছরে ১২ হাজার ৬০০ কেজি খাবার পেটে ঢুকে থাকবে। আল্লাহ এই হাজার হাজার কেজি খাবারের হিসেব নেবেন। এগুলো কি হালালভাবে উপার্জন করা হয়েছিলো এবং এগুলো খেয়ে বান্দাহ কি কাজ করেছিলো ? আমরা সেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি যিনি আমাদেরকে পানীয় ও খাবার খাইয়েছেন। অথচ আমরা তা তৈরি করিনি।

৩. কান ঃ কান মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, শিশু জন্মের পরপর প্রথমে কানে শোনে। কিন্তু প্রথম কয়েকদিন চোখে দেখে না। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত এ তথ্যের সাথে হাদীসের হুবহু মিল আছে। মহানবী (স) জন্মের পর শিশুর ডান কানে আযান এবং বাম কানে একামত দানের নির্দেশ দিয়েছেন। যেন দুনিয়াতে এসে সে সর্বপ্রথম আল্লাহর নাম শুনতে পায়। আল্লাহ কান সম্পর্কে বলেন ঃ

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُوْلٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً -

"নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬

কুরআনের এ আয়াতে চোখের আগে কানের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ আগে কানে শোনা এবং পরে চোখে দেখার সৃষ্টি রহস্যের দিকেই হয়তো ইঙ্গিত দিয়েছেন।

কান যা শুনে সে জন্য তাকে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে। কান দিয়ে ভাল জিনিস শুনতে হবে, খারাপ, মন্দ ও অশ্লীল জিনিস শুনা যাবে না। নেক লোকদের কানের গুণের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوا عَنْهُ - القصص : ٥٥

"তারা যখন বেহুদা কথা শুনে তখন তারা তা এড়িয়ে যায়।"

–সূরা কাসাস ঃ ৫৫

গান-বাজনা প্রিয় যুবক-যুবতীদেরকে সাবধান হতে হবে।

আমরা মিনিটে কমপক্ষে ১টি কথা শুনলে, ঘণ্টায় ৬০টি এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে ঘুমের ৬ ঘন্টা বাদ দিলে অবশিষ্ট ১৮ ঘণ্টায় ১০৮০টি, মাসে ৩২,৪০০টি, বছরে ৩ লাখ ৮৮ হাজার ৮০০টি এবং ৭০ বছরে ২ কোটি ৭১ লাখ ১৬ হাজার শব্দ শুনে থাকি। এর মধ্যে কয়টি ভাল কথা আমরা শুনতে পেয়েছি ? অথচ, কানকে শুনা কথার জন্য উপরোক্ত আয়াতে দায়িত্বশীল করা হয়েছে। কান দিয়ে বেশী বেশী দীনি কথা শুনার চেষ্টা করতে হবে।

৪. জিহ্বা ঃ জিহ্বা মানব শরীরের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জিহ্বা দিয়ে ভাল ও মন্দ কথা বলা হয়। ইসলামের দাওয়াতও দেয়া হয়। পক্ষান্তরে কুফর, বাতিল ও ভ্রান্ত মতবাদের দিকে জিহ্বাই আহ্বান জানায়। একই জিহ্বা দিয়েই আল্লাহর স্মরণ এবং শয়তানের স্মরণ দু'টোই হয়ে থাকে। জিহ্বাই বন্ধু ও শত্রু সৃষ্টি করে। জিহ্বাই গীবত-নিন্দা, অপবাদ, চোগলখুরী, অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ ও গালি-গালাজ করে। তাই জিহ্বাকে সংযত না রাখলে মু'মিনের উপায় নেই।

একদিন মহানবী (স) হযরত মোআজকে বলেন ঃ "হে মোআজ ! এটাকে সংযত রাখ। তিনি একথা বলে নিজ জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করেন। তখন মোআজ বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা যে সকল কথা বলি, সেগুলোর ব্যাপারেও কি আল্লাহ পাকড়াও করবেন ? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ সর্বনাশ, হে মোআজ ! জিহ্বার খারাপ ফসল হিসেবেই মানুষকে তার নিজ চেহারার উপর উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"–আহমদ, তিরমিজী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ।

জিহ্বাকে যেন আমরা হেফাজত করি। নচেত বিরাট বিপদ আছে। আল্লাহ বলেন ঃ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌO - ق : ١٨

"কোনো কথা উচ্চারণ করার সাথে সাথে অপেক্ষমান পর্যবেক্ষক প্রস্তুত থাকে।"–সূরা ক্বাফ ঃ ১৮

সাহাল বিন মোআজ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ "যে আমাকে তার দুই চোয়াল ও রানের মধ্যবর্তী স্থানের নিশ্চয়তা দেবে, আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দেবো।"–বুখারী

জিহ্বা দিয়ে ভাল কথা আলোচনা করতে হবে। আল্লাহর জিকর, কুরআন পাঠ, দীনের দাওয়াত, সত্য ও সুন্দর কথা বলার চেষ্টা করতে হবে। ভাল কথার কোনো অভাব নেই। তাই ভাল কথাই বলতে হবে এবং খারাপ ও মন্দ

কথা থেকে দূরে থাকতে হবে। জিহ্বা দিয়ে ঘণ্টায় গড়ে ৫০টি কথা বললে, দিনে ১৮ ঘণ্টায় ৯০০, মাসে ২৭০০০, বছরে ৩ লাখ ২৪ হাজার এবং ৭০ বছর বয়সে ২ কোটি ২৬ লাখ ৮০ হাজার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে কয়টি কথা আল্লাহর দীনের জন্য বলা হয়েছে ? এ হিসেব দিতে হবে।

৫. চোখ ঃ এটা মানব শরীরের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। অন্য কোনো অঙ্গ না থাকলেও ইচ্ছা করলে গুনাহ্ করতে পারে। কিন্তু চোখ না থাকলে সাধারণত কোনো গুনাহ্ করা সম্ভব নয়। তখন গুনাহর কাজ দেখা যায় না, করাও যায় না। নিজে চলতে পারে না বলে গুনাহর কাজ পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া সম্ভব হয় না। চোখে দেখার পর ভাল বা মন্দ কাজের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাই চোখ হচ্ছে উদ্দীপক। আল্লাহ্ মু'মিনের মনে চোখের ভাল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط - النور : ٣

"হে নবী ! আপনি মু'মিনদেরকে বলে দিন তারা যেন নিজেদের চোখকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।"–সূরা আন নূর ঃ ৩০

চোখ দিয়ে ঘণ্টায় ১০০টা জিনিস দেখলে, দৈনিক ১৮ ঘণ্টায় ১৮০০, মাসে ৫৪ হাজার, বছরে ৬ লাখ ৪৮ হাজার এবং ৭০ বছর বয়সে ৫ কোটি ৪৩ লাখ ৬০ হাজার জিনিস দেখা হয়ে থাকে। অন্ধ মানুষের তুলনায় এ দেখার সামর্থ কত বড় নেয়ামত ! এ চোখ দিয়ে আল্লাহর দীনকে বুঝার উপায়-উপকরণকে আমরা কতবার দেখেছি, এ প্রশ্নের জবাব দেয়া যাবে কি ?

৬. লজ্জাস্থান ঃ লজ্জাস্থান মানব জীবনে আল্লাহর অপ্রকাশিত নেয়ামত-সমূহের অন্যতম। এর হেফাজত না করলে বিপর্যয় সুনিশ্চিত। আজ বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে পাশ্চাত্যে যে যৌন কেলেংকারী সৃষ্টি হয়েছে তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ মানব সমাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। জানা কথা, পরিবার ধ্বংস হয়ে গেলে মানব সমাজের অস্তিত্ব পশুর সমতুল্য হতে বাধ্য। পাশ্চাত্যে হচ্ছেও তাই। তাই ইসলাম লজ্জাস্থানের হেফাজতের উপর জোর দিয়েছে। মহানবী (স) বলেছেন ঃ

مَنْ يَّضْمَنُ لِىْ مَابَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ اَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ -

"যে আমাকে তার দুই চোয়াল ও রানের মধ্যবর্তী স্থানের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে, আমি তার জান্নাতের নিশ্চয়তা দেবো।"–বুখারী

এ হাদীসে জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মানবদেহের এ দু'টো অঙ্গই বেশী বিপজ্জনক। এ দু'টো স্থান থেকেই আক্রমণের পথ রচনা করতে শয়তান বেশী সুবিধে পায়। জিহ্বা ও লজ্জাস্থান দিয়েই পাপ কাজ বেশী সংঘটিত হয়। তাই আল্লাহ্ সফল মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

وَالَّذِينَ هُم لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُوْنَ - المؤمنون : ٥

"যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী।"—সূরা মু'মিনূন ঃ ৫

তিনি আরো বলেন ঃ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُم .... قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ - النور : ٣٠-٣١

"হে নবী ! আপনি মু'মিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন চোখ অবনত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে .... মু'মিন মহিলাদেরকেও বলে দিন তারা যেন নিজেদের চোখ অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।"—সূরা আন নূর ঃ ৩০-৩১

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা ইসলামের পরিবার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো।

দুই. পরিবার সংশোধন

স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমেই পরিবার গঠিত হয়। বিয়ে হচ্ছে পরিবার গঠনের চিরন্তন ও শ্বাশত পদ্ধতি। তাই যুবক-যুবতীর জীবনে বিয়ে এক বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। ইসলাম বিয়ের মাধ্যমে যৌন আচরণকে নিয়ন্ত্রিত ও সংগঠিত করে। পাশ্চাত্যে রয়েছে অবাধ যৌনাচার। পশু ও মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সেখানে চলছে বেহায়াপনা, সমকামিতা ও বহুগামিতা ইত্যাদি। সে জন্য লিভ টুগেদার, বয় ফ্রেণ্ড, গার্ল ফ্রেণ্ড পদ্ধতি চালু রয়েছে। অধুনা নারী-নারীতে এবং পুরুষ-পুরুষে পরিবার গঠনের বিকৃত দাবীও উঠেছে। সৃষ্টির সেরা মানুষের জন্য আফসোস। তারা কত নীচুতে নামতে পারে !

ইসলাম পরিবারকে মানব জীবনের শান্তি-স্বস্তির উৎস বিবেচনা করে। আল্লাহ কুরআন মজীদে এরশাদ করেছেন

وَمِنْ اٰيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً - الروم : ٢١

"তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটাও একটা যে, তিনি তোমাদের থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের নিকট শান্তি ও স্থিতি লাভ করতে পার। আর তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা ও হৃদ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।"–সূরা আর রূম ঃ ২১

আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি করে সন্তান প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ج - النساء : ١

"হে মানুষ ! তোমরা তোমাদের সেই মহান রবকে ভয় করে তাঁর আদেশ -নিষেধ মেনে চল, যিনি একটি মাত্র আত্মা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর তার থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার জুড়ি। আর এ দু'জন থেকেই ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য নারী ও পুরুষ।"–সূরা আন নিসা ঃ ১

স্বামী-স্ত্রীর বৈধ মিলন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বংশধারা, তৈরি হয়েছে আত্মীয়তা। আল্লাহ ব্যক্তির সংশোধনের সাথে পরিবারের সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর যার জ্বালানী হল মানুষ ও পাথর।"–সূরা তাহরীম ঃ ৬

পরিবার সংশোধন বলতে প্রধানতঃ তিনটি কাজ বুঝায়। ১. স্ত্রীর সংশোধন, ২. স্বামীর সংশোধন, ৩. সন্তানের সংশোধন।

১. স্ত্রীর সংশোধন ঃ স্ত্রীকে সংশোধন করার দায়িত্ব স্বামীর। কেননা, তিনিই পরিবার প্রধান। আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّمُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ط - النساء : ٣٤

"পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৪

স্ত্রীকে গড়ে তোলার ব্যাপারে অলসতা করা যাবে না। যেন বাতির নীচে অন্ধকার না থাকে। নেক স্ত্রী স্বামীর সকল কাজের সহযোগীনী ও সহায়িকা হবে। এজন্য মহানবী (স) বলেছেন ঃ

اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ـ

"দুনিয়ার সকল কিছুই সম্পদ। দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ হচ্ছে নেক স্ত্রী।"–মুসলিম

স্ত্রী যেন উত্তম সম্পদে পরিণত হয় সে চেষ্টা করতে হবে। সাওবান থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-কে সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তরে বলেন ঃ

لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهُ عَلَى دِيْنِهِ ـ

'সর্বাধিক উত্তম সম্পদ হল, আল্লাহর যিকর রত জিহ্বা, শোকর গুজার অন্তর এবং ঈমানদার স্ত্রী, যে দীনি কাজে স্বামীকে সাহায্য করে।'
–তিরমিজী

২. স্বামীর সংশোধন ঃ স্বামী যদি দীনদার না হয়, তাহলে স্ত্রীর দায়িত্ব হল, তাকে সংশোধন করা। যেহেতু স্বামী জীবন সঙ্গী, তাই তার সংশোধন সর্বাগ্রে হওয়া দরকার। আল্লাহ কুরআন মজীদে বলেছেন ঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط ـ البقرة : ١٨٧

"তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের আবরণ এবং তোমরা (স্বামীরা)-ও তাদের আবরণ।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৭

স্ত্রী যেমন স্বামীর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত তেমনি স্বামীও স্ত্রীর জন্য নিজ পরিবারের সদস্য হিসেবে বিবেচিত। স্বামী স্ত্রী পরস্পরের পরিপূরক। স্বামী স্ত্রী কেউ কারো অনৈসলামী কাজের সহযোগিতা করবে না। সবাই সুখী-সুন্দর পরিবার গঠনে একই সাথে কাজ করবেন।

৩. সন্তানের সংশোধন ঃ পরিবারের পরবর্তী পর্যায়ের কাজ হবে সন্তান-সন্ততির যথার্থ প্রতিপালন। তাদেরকে উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা দিতে হবে। তারা হল কোমল ও কচিকাঁচা। যেভাবে গড়া হবে সেভাবেই গড়ে উঠবে। তারা হচ্ছে কুমারের কাঁচা পাতিলের মত। যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে বাঁকা-সোজা করা যায়। তারপর তাকে পাকা করা হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَامِنْ مَوْلُوْدٍ اِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ اَوْ يُنَصِّرَانِهٖ اَوْ يُمَجِّسَانِهٖ كَمَا تُنْتِجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا جَدْعَاءَ ؟

"প্রত্যেক শিশু স্বভাবগত প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদী অথবা খৃস্টান কিংবা অগ্নি পূজারী বানায়। যেমন করে পশু নিখুঁত শাবক জন্ম দেয় ; তোমরা কি তাতে কোনো ত্রুটি দেখতে পাও ?"–মেশকাত, বুখারী, মুসলিম

এ হাদীসে নবজাত শিশুর শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা জন্মগ্রহণ করার পর তাদেরকে যাই শিক্ষা দেয়া হয় তারা তাই শিখে। তাদেরকে ইহুদী, খৃস্টান কিংবা মোশরেক হিসেবে গড়ে তুললে তারা সেভাবেই গড়ে উঠবে, অনুরূপভাবে ভাল মুসলমান বানাতে চাইলে, ভাল মুসলমানও হবে। এসবই মাতা-পিতার দায়িত্ব বলে মহানবী (স) উল্লেখ করেছেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, পশু যখন নিখুঁত বাচ্চা প্রসব করে তখন তার মধ্যে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে না। কিন্তু তারপর তার কান কাটা হয়, দাগ দেয়া হয় এবং বিভিন্ন খুঁত সৃষ্টি করা হয়। অথচ জন্মগতভাবে তা হচ্ছে নির্দোষ। অনুরূপভাবে, দুনিয়ার জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নবজাত শিশুই নিখুঁত ও নির্দোষ। তাদের মা-বাপ এবং সমাজ কিংবা পরিবেশই কেবল তাদেরকে অমুসলমান, কাফের, মোশরেক বানায়। তাই সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিলে সে জন্য মা-বাপকে দায়ী হতে হবে।

ফরাসী শাসক ও সেনাপতি নেপোলিয়ান বোনাপার্টের একটি প্রসিদ্ধ উক্তি আছে। তিনি বলেছেন ঃ 'তোমরা আমাকে আদর্শ মা দাও, আমি তোমাদেরকে আদর্শ জাতি উপহার দেবো।' তিনি আদর্শ মায়ের উপর জোর দিয়েছেন।

মূলতঃ মা-বাপের উপরই নির্ভর করে তারা সন্তানকে ভাল না মন্দ বানাবে। মেয়েদের ব্যাপারে মায়ের ভূমিকা এবং ছেলেদের ব্যাপারে বাপের ভূমিকা বেশী কার্যকর।

নেক সন্তান তৈরি করলে মাতা-পিতা শুধু দুনিয়াতেই শান্তি পাবে না বরং পরকালেও শান্তি পাবে। সন্তান মা-বাপের মৃত্যুর পর তাদের জন্য দোয়া করবে। এ মর্মে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِذَا مَاتَ ابْنُ اٰدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ ـ

"আদম সন্তান মারা গেলে তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, শুধুমাত্র তিনটি আমলের সওয়াব অব্যাহত থাকে। ১. সদকা জারিয়াহ ২. উপকারী জ্ঞানের সেবা ৩. নেক সন্তান, যে মা-বাপের জন্য দোয়া করে।"
–বুখারী, মুসলিম

শিশুকাল থেকেই তাদেরকে আল্লাহ, নবী ও দীন সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে যেন এর ভিত্তিতে বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস গড়ে উঠে। তাদেরকে দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে হবে এবং তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করতে হবে। তাদেরকে পবিত্রতা অর্জন, অজু-গোসল, নামায, কুরআন পাঠ, জিকর, দোয়া, আদব-আখলাক, সত্যবাদিতা, নেক আমল, আল্লাহর অধিকার, মাতা-পিতার অধিকার, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার, সালাম দান ও আনুগত্যের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। অপরদিকে তাদের মধ্যে সকল খারাপ অভ্যাস ও আচরণের বিরুদ্ধে ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করতে হবে। তাদেরকে খারাপ চরিত্র, গুনাহ, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন, মিথ্যা, জুলুম, গালি-গালাজ, অভিশাপ, গান-বাজনা, মাদকতা বেপর্দা ও ধূমপানের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিতে হবে। তাদেরকে দীনি জ্ঞানের মজলিশ, সৎলোকের সাহচর্য ও ভাল সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামে যোগদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ছোট সন্তান বালেগ হওয়ার পর বিয়ে-শাদী পর্যন্ত মা-বাপকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ দীর্ঘ সময়ে সন্তান কোনো অন্যায় আবদার করলে তা শুনা যাবে না। যেমন, গান-বাজনার জন্য ভিডিও, ফিল্ম, নগ্ন ছবি, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি চাইলে তা সরবরাহ করা যাবে না।

মাতা-পিতার আনুগত্য ঃ মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের আনুগত্য ফরয। যদি না তা ইসলাম বিরোধী হয়। ইসলাম বিরোধী আদেশ দিলে তা মানা যাবে না। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط ـ

"তোমার প্রভু ফয়সালা দিয়েছেন যে, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩

মাতা-পিতার সাথে দুর্ব্যবহার করা যাবে না। আল্লাহ বলেন ঃ

فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ○

"মাতা-পিতাকে উহ্ ! শব্দটি পর্যন্ত বল না, তাদেরকে তিরস্কার কর না এবং তাদের সাথে ভাল কথা বল।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩

সন্তানকে মা-বাপের জন্য দোয়া করতে হবে। আল্লাহ সে দোয়াও শিক্ষা দিয়েছেন। সন্তান বলবে ঃ

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا ط - بنى اسرائيل : ٢٤

"হে আমাদের রব ! তাদের দু'জনের উপর তুমি এমন সদয় রহম কর, যেমনি করে তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছে।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৪

মাতা-পিতার অধিকার এবং বিশেষ করে মায়ের অধিকার সম্পর্কে মহানবী (স) অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ ؟ قَالَ اُمُّكَ ، قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اُمُّكَ ، قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اُمُّكَ ، قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اَبُوْكَ .

"এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমার সর্বোত্তম ব্যবহারের অধিকারী কে ? নবী (স) বলেন ঃ তোমার মা। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করল ঃ তারপর কে ? তিনি বলেন ঃ তোমার মা। লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করল ঃ তারপর কে ? তিনি এবারও জবাব দিলেন ঃ তোমার মা। লোকটি পুনঃ জিজ্ঞেস করল ঃ অতপর কে ? এবারে নবী (স) জবাব দিলেন ঃ তোমার বাপ।"–বুখারী, মুসলিম

এ হাদীসে বাপের চাইতে মায়ের অধিকার তিনগুণ বেশী বলা হয়েছে। কেননা, মা গর্ভ ধারণ থেকে সন্তানের বড় হওয়া পর্যন্ত নজীরবিহীন কষ্ট করেন।

অন্য আরেক হাদীসে মহানবী (স) বলেছেন ঃ اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ "মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশত।"

সন্তানদেরকে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নিম্নোক্ত ঘটনার দৃষ্টান্ত শিক্ষা দিতে হবে। এক লোক তাঁর কাছে নিজ মায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করে। তিনি ঘটনা শুনার পর একটা কাঁঠাল আনেন এবং লোকটির পেটে বেঁধে দিয়ে বলেন, তুমি এ অবস্থায় কিছুক্ষণ হেঁটে আস। পরে আমি তোমার মায়ের বিচার করবো। ছেলে ভারী কাঁঠালের বোঝা সহকারে সামান্য হেঁটেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং আর হাঁটতে পারল না। তারপর সে নিজেই বলল, হুজুর ! আমি আমার অন্যায় বুঝতে পেরেছি। আর মায়ের বিচার লাগবে না।

আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ "পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরযা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হেফাজত কর অথবা একে নষ্ট করে দাও।"–আহমদ, তিরমিজী, ইবনে মাজাহ, মুস্তাদরাক সনদ বিশুদ্ধ।

আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলঃ সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক কি ? তিনি বলেন ঃ তারা উভয়েই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।"–ইবনে মাজাহ

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ "যে সেবাকারী পুত্র মা-বাপের দিকে দয়া ও ভালবাসা সহকারে দেখে, প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি কবুল হজ্জের সওয়াব পাবে। লোকেরা প্রশ্ন করল ঃ সে যদি এভাবে একশবার নজর করে ? তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ, একশবার দেখলেও প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এই সওয়াব পেতে থাকবে।"–বায়হাকী

সন্তানের উপর মা-বাপের অধিকার অনেক বেশী। সন্তানদেরকে তা পূরণ করতে হবে। এভাবেই সুখী-সুন্দর পরিবার গড়ে উঠবে।

তিন. সমাজ সংশোধন

পরিবার হচ্ছে, সমাজের মূল ভিত্তি। এ পরিবারগুলোই সমাজের জাতি-গোষ্ঠী সৃষ্টি করে। সমাজ বলতে পরিবার ভিত্তিক জাতি ও দলকে বুঝায়। সমাজ আল্লাহরই বিরাট নেয়ামত ও করুণা। তিনি পবিত্র কুরআন মজীদে বলেছেন ঃ

وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا - الحجرات : ١٣

"আমরা তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও।"–সূরা হুজুরাত ঃ ১৩

দয়াময় আল্লাহ মানব জাতির শান্তি-স্বস্তি ও স্থিতিশীলতার জন্যই সমাজ সৃষ্টি করেছেন। সমাজের প্রত্যেকেই পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

মানুষ সামাজিক জীব। একাকী বাস করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ মানুষের সুষ্ঠুভাবে চলার জন্য দিয়েছেন ইসলামী সমাজব্যবস্থা। সমাজের গোটা নেতৃত্ব যুব সমাজের হাতে। সমাজকে আল্লাহর আকাঙ্ক্ষিত পথে পরিচালনা করা তাদের বিশেষ দায়িত্ব। দুনিয়ার সকল দেশের মুসলমান, ব্যাপক অর্থে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক মুসলমানকে বিশ্বের সকল মুসলমানের কল্যাণে, বিশেষভাবে এবং সকল মানুষের কল্যাণে, সাধারণভাবে কাজ করতে হবে।

সামাজিক কাজকর্ম ও দায়-দায়িত্ব থেকে দূরে থাকা ইসলামের পরিপন্থী। বরং সমাজ হচ্ছে, মু'মিনের ইবাদাতের মেহরাব, যেখানে দাঁড়িয়ে সে ইমামের দায়িত্ব পালন করবে। হোজায়ফা বিন ইয়ামান থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ لاَيَهْتَمْ بِاَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ -

"যে মুসলমানদের সামষ্টিক বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"–তাবরানী

সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সংশোধনের লক্ষ্যে তাদের মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগ এবং প্রশিক্ষণের কাজ আঞ্জাম দিতে হবে। সমাজ সংশোধনের মহান দায়িত্ব দিয়েই আল্লাহ মহানবী (স)-কে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِه وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ -

"তিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হেকমত।"–সূরা জুমআ ঃ ৩

এ আয়াতে, সমাজের মানুষের প্রতি মহানবী (স)-এর কুরআন তেলাওয়াত, তাদের আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেয়ার কথা উল্লেখ আছে। মহানবীর ওয়ারিশ হিসেবে পরবর্তী যুগের জ্ঞানী যুবক-যুবতীদেরকে ও সমাজের মানুষকে কুরআন ও দীনি শিক্ষা, তাদের আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ এবং হাদীসসহ সকল জ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে।

সমাজে রয়েছে পাপ-তাপ, অন্যায়-অবিচার। এগুলোকে দূর করতে হবে আর সে জন্য তাদেরকে আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার তথা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের প্রতিরোধ করতে হবে। এটা ফরয। এটা না করলে ভাল-মন্দ সকল লোকের উপর আজাব আসবে। তা থেকে ভাল মানুষগুলো রেহাই পাবে না। আল্লাহ বলেন ঃ

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَتُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً -

"তোমরা সেই ফেতনাকে ভয় কর যা কেবল তোমাদের জালেমদের পর্যন্ত সীমিত থাকবে না।"–সূরা আনফাল ঃ ২৫

জালেমরা অন্যায় করলে তাদেরকে প্রতিহত না করা হলে পরিণামে যে আজাব আসবে তা তাদের গণ্ডীকে ছাড়িয়ে যাবে এবং যারা জালেম নয় তাদের পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। জালেমের জুলুমের প্রতিরোধের জন্যই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধের হুকুম। এ কাজ না করলে দোয়া কবুল হয় না। হাদীসে আজাবের কথাও এসেছে।

সমাজের ও সামাজিকী করণের রয়েছে বিভিন্ন উপাদান। সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করলেই সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব কর্তব্যের বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

১. পরিবার ঃ আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পরিবার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

২. পাড়া-প্রতিবেশী ঃ বাড়ীর আশেপাশে যারা থাকেন তারাই আমাদের প্রতিবেশী। পরিবারের সদস্যদের পর সবদিক বিবেচনা করলে প্রতিবেশীরা আমাদের আপনজন। সুখে-দুঃখে এবং সুবিধায় অসুবিধায় প্রতিবেশীরাই আমাদের অনেক কাজে আসে।

পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপন করলে সৎ প্রতিবেশীসূলভ আচরণ জরুরী। প্রতিবেশীর প্রতি সম্মান, যত্ন ও অধিকার পূরণ করা ফরয।

ইবনে ওমার ও আয়েশা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

"জিবরীল (আ) আমাকে প্রতিবেশীর বিষয়ে অব্যাহত অসিয়ত করতে থাকায় আমি ধারণা করেছিলাম যে, প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী করা হবে।"–বুখারী, মুসলিম

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ .... الخر .

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।"–বুখারী, মুসলিম

রাসূলুল্লাহ (স) প্রতিবেশীর প্রতি অধিক যত্ন নেয়ার উপর জোর দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

يَا اَبَا ذَرٍّ اِذَا طَبَخْتَ مَرْقَةً فَاَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ ـ

"হে আবু জার ! যখন শুরবা পাকাবে, তখন ঝোল একটু বেশী দেবে এবং তোমার প্রতিবেশীকে কিছু উপহার দেবে।"–মুসলিম

রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে বলেছেন ঃ

مَا اٰمَنَ بِىْ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهٗ جَائِعٌ اِلَى جَنْبِهٖ وَهُوَ يَعْلَمُ -

"সে ব্যক্তি আমার উপর ঈমান আনেনি যে নিজে পেট পুরে খায় এবং তার প্রতিবেশী উপোষ বলে সে জানে।"–তাবরানী, বাজ্জার, সনদ ভাল।

দীনের দাওয়াত ও তাবলীগ প্রতিবেশীর প্রতি বেশী কার্যকর। পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ লোকের প্রতি দাওয়াত দিতে সুবিধে বেশী। সকল পরিবার নিজ প্রতিবেশীদেরকে সংশোধন করতে পারলে তৃণমূল পর্যায়ে দীন প্রতিষ্ঠা সহজ এবং স্থানীয় ভিত্তি ও পরিবেশ তৈরি হবে।

প্রতিবেশীর কোনো ক্ষতি করা যাবে না। মহানবী (স) বলেছেন ঃ "আল্লাহর কসম, সে ব্যক্তি মু'মিন নয়, সে ব্যক্তি মু'মিন নয়, সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। জিজ্ঞেস করা হল, কে ইয়া রাসূলাল্লাহ ? তিনি বলেন, যার প্রতিবেশী তার ক্ষতি থেকে নিরাপদ নয়।"–আহমদ, বুখারী, মুসলিম

প্রতিবেশীকে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ, উপদেশ, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে।

৩. সহপাঠি ঃ কর্মজগতে সহপাঠি সৃষ্টি হয়। একাকী কোনো কাজ হয় না। একই অফিস ও কল-কারখানার শরীক অন্যান্য ভাইদেরকে নিয়ে কাজ করতে হয়। এভাবে নিজেদের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠে। সহপাঠির সাথে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। কোনো কোনো সময় আপনজনের চাইতেও নিকটতর হয়ে যায়। তাই সহপাঠিকে দীনের দাওয়াত দিয়ে সংশোধন করা জরুরী এবং সহজও বটে। একে অপরকে ঘনিষ্ঠভাবে বুঝার কারণে দাওয়াতে দীনের মধ্যে কোনো ফাঁক বা সন্দেহ দেখা দেবে না। যেহেতু, একজন আরেকজন থেকে নিজ চরিত্র গোপন করতে পারে না। সহপাঠি নিজে হেদায়েত হলে পরে পরিবার ও প্রতিবেশীর মধ্যে দীনের দাওয়াতী কাজ করতে সক্ষম হবেন।

সহপাঠির অধিকার অনেক। তার সুখে-দুঃখে অংশগ্রহণ, সৎ পরামর্শ ও উপদেশ দান, কল্যাণ কামনা এবং ক্ষতি দূর করা সহ মানবিক সেবা প্রদান করতে হবে। আল্লাহ সহপাঠির অধিকার পূরণের বিষয়ে বলেছেন ঃ

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۷ - النساء : ٣٦

"তোমরা মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, প্রতিবেশী নিকটাত্মীয়, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সহপাঠি এবং মুসাফিরের প্রতিও।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৬

আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

خَيْرُ الْاَصْحَابِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهٖ -

"আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজ সাথী ও সহপাঠির কাছে সর্বোত্তম।"–তিরমিজী

সমাজ জীবনে সহপাঠির ভূমিকা অপরিসীম।

৪. আত্মীয়-স্বজন ঃ মানব সমাজে আত্মীয়-স্বজন বিরাট গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আত্মা থেকে আত্মীয়তার সৃষ্টি। এর দ্বারা আত্মীয়তার অধিকার ও গুরুত্ব বুঝা যায়। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ফরয। নিকটাত্মীয়ের অধিকার দূরাত্মীয়ের চেয়ে বেশী। নিকটাত্মীয় বলতে মা ও বাপের দিকের আত্মীয়দেরকে বুঝায়। বাপের দিকের আত্মীয় যেমন, ভাই-বোন, চাচা, জেঠা, দাদা, দাদী, ফুফু-ফুফা ও তাদের সন্তানরা। আর মায়ের দিকের আত্মীয় হল ঃ নানা-নানী, খালা, মামা ও তাদের সন্তান-সন্ততি। এছাড়া অন্যান্য আত্মীয়রা হচ্ছে দূরাত্মীয়, কিন্তু আজকাল নিকটাত্মীয়ের পরিবর্তে দূরাত্মীয় যেমন শ্বশুর পক্ষের আত্মীয়দেরকে বেশী যত্ন করা হয়।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ও অধিকার রক্ষার উপর আল্লাহ অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَلرَّحِمُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ : مَنْ وَصَلَنِيْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللّٰهُ -

"আত্মীয়তা আরশের সাথে ঝুলন্ত আছে। সে বলে ঃ যে আমার সাথে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখবেন। আর যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।"–বুখারী, মুসলিম

মূলকথা, আত্মীয় স্বজন না থাকলে দুনিয়াতে চলাই মুশকিল। রক্তের সম্পর্কের টান বিরাট বিষয়। তাদেরকে হেদায়েত করা, দীনের দাওয়াত দেয়া এবং সাথে নিয়ে দীন কায়েম করার চেষ্টা করা বিরাট সহায়ক ব্যাপার। যার আত্মীয় নেই, সমাজে সে দুর্বল বলে বিবেচিত। কেননা দলবলহীন লোক শক্তিহীন। আল্লাহ আত্মীয়ের প্রতি দীনের দাওয়াত দানের জন্য মহানবীর জবানীতে আমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ - الشعراء : ٢١٤

"তুমি তোমার নিকটাত্মীয়ের প্রতি ভয় প্রদর্শন কর।"

–সূরা শোআরা ঃ ২১৪

অনেকে উদাসীনতা ও অবহেলা করে আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগ রাখে না। তাদের সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ করে না। তাই যদি হয় তাহলে রক্তের সম্পর্কের মূল্য কোথায়? আত্মীয়কে দীনের পথের সহায়ক শক্তিতে পরিণত করা দরকার।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি ঃ

اِنَّ اَعْمَالَ بَنِىْ اٰدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيْسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ -

"প্রত্যেক জুমা রাত্রে বনি আদমের আমল আল্লাহর কাছে পেশ করা হয়। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর আমল আল্লাহ কবুল করবেন না।"-আহমদ

বিপদে-আপদে আত্মীয়রাই এগিয়ে আসে। ইসলাম আত্মীয়তার প্রতি গুরুত্বদানের জন্য যাকাত গরীব আত্মীয়কে দানের নির্দেশ দিয়েছে এবং বলেছে তাতে দান এবং আত্মীয়তা এ দু' কারণে দ্বিগুণ সওয়াব হয়।

প্রত্যেক নিজ নিজ আত্মীয়কে দীনের পথে নিয়ে আসতে চেষ্টা করলে সমাজের বিরাট অংশের নিকট দীনের দাওয়াত সহজে পৌঁছানো সম্ভব।

৫. সামাজিক প্রতিষ্ঠান ঃ সমাজে রয়েছে বিভিন্ন দল, সংস্থা, কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান। যেমন, শিশু-কিশোর সংগঠন, ডাক্তার, ইঞ্জিয়ার, আইনজীবিদের, পেশাজীবি সংগঠন, সমাজ সেবা ও কল্যাণ সংস্থা, সাহিত্য, গবেষণা ও প্রকাশনা কেন্দ্র, বিনোদন ক্লাব, নাট্যগোষ্ঠী, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। এগুলো সবই সমাজের সদস্যদের সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় জড়িত। আর এগুলোই সমাজকে প্রভাবিত করে। এ

সকল সংস্থা, দল, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানে ইসলামের দাওয়াতী কর্মসূচী ছড়িয়ে দিতে হবে। তারা সাধারণত বস্তুবাদী, ধর্মনিরপেক্ষবাদী, জাতীয়তাবাদী, সমাজবাদী ও কায়েমী স্বার্থবাদী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে থাকে। তাদেরকে কে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেবে ? অথচ তারাই সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তারাই সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য লোক সরবরাহ করছে। সমাজের প্রভাবশালী গোষ্ঠীকে ধরতে ও সংশোধন করতে না পারলে জাতীয় পরিবেশ দূষিত হতে বাধ্য। আজকের নাট্যক্লাব, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংস্থার নবীন ও ক্ষুদ্র সদস্যরা আগামী দিন রেডিও, টেলিভিশন, জাতীয় প্রচার মাধ্যম, পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের মূল নায়ক। আজকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী আগামী দিনের শিক্ষক, অধ্যাপক ইত্যাদি।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র দাওয়াতী কাজ করলে এর ভাল ফল পাওয়া যাবে। সেখানে রাজনৈতিক তৎপরতা সংঘর্ষের জন্ম দেবে। তখন অধিকাংশ লোক দীনি কথা শুনার জন্য প্রস্তুত থাকবে না। দীন একবার অন্তরে প্রবেশ করলে, পরে রাজনৈতিক দর্শন ঢুকালে সহজ হবে। তাই আগে রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করলে তা হবে অগ্রিম কর্মসূচী। একে 'ঘোড়ার আগে গাড়ী জোড়ার' সাথে তুলনা করা যায়। সমাজ সংশোধনের পথে তা অন্তরায় সৃষ্টি করবে। মসজিদ, মাদ্রাসা, ইসলামী পাঠাগার, ইয়াতীম খানা, ইসলামী কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলোকে পরিকল্পিতভাবে দাওয়াতী কাজে ব্যবহার করতে হবে। কেননা, এগুলো দাওয়াতী কাজের জন্যই পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত। দরকার শুধু সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার। এখানে সতর্ক থাকতে হবে যেন ব্যক্তিত্বের সংঘাত, নেতৃত্বের কোন্দল বা অন্য কোনো স্বার্থপরতা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে। সাধারণতঃ এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ সকল সমস্যা প্রকট বলে মূল কাজ তেমন কিছু হয় না। ভাসা ভাসা ও গতানুগতিক কিছু কাজ হয় মাত্র। দাওয়াতী কাজের জন্য এর চেয়ে উত্তম হাতিয়ার আর কি হতে পারে ?

দাওয়াতে দীনের কর্মীকে এ জাতীয় কোনো একটা বা একাধিক প্রতিষ্ঠানকে সামনে রেখে কাজ করতে হবে। তাতে কাজের গতি জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাবে।

৬. সামাজিক রীতি-নীতি ও কৃষ্টি-প্রথা ঃ প্রত্যেক সমাজেই জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন রীতি-নীতি ও কৃষ্টি-প্রথা চালু রয়েছে। বিয়ে-শাদী, শিক্ষা-দীক্ষা, চাকুরী-বাকুরী, কৃষি, ফসল, আনন্দ, উৎসব, খেলা-ধূলা, খাওয়া-দাওয়া, বেড়ানো, ভ্রমণ-বিহার, ঘুম-নিন্দ্রা, কাজ-কর্ম ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন

রীতি-প্রথা চালু আছে। যেমন, পরীক্ষায় ভাল ফলাফল কিংবা বিয়ে করলে, মিষ্টি খাওয়াবে, খাওয়ার পরে মিষ্টান্ন খাওয়া, প্রমোশন হলে স্ত্রীর জন্য শাড়ী উপহার, বিদেশ সফরের সময় সবার কাছ থেকে দোয়া চাওয়া, অন্যান্য পোশাক থাকা সত্ত্বেও নারীদের শাড়ী এবং পুরুষের লুঙ্গি পরা, পিঠা ও আচার খাওয়া ইত্যাদি হচ্ছে সামাজিক রীতি-নীতি ও কৃষ্টি প্রথার অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে যেগুলো বৈধ, কল্যাণকর এবং ইসলামের সাথে সংঘর্ষমুখর নয়, সেগুলো তো অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। উল্লেখিত উদাহরণগুলোর কোনোটাই ক্ষতিকর বা অবৈধ নয়। কিন্তু কতকগুলো কৃষ্টি-প্রথা আছে অবৈধ, ক্ষতিকর, কুসংস্কার, যেগুলোতে অপচয়ও জড়িত আছে। সেগুলো জায়েয নেই। যেমন, জন্ম দিবস, মৃত্যু দিবস ও ম্যারিজ ডে পালন করা এবং গায়ে হলুদ ও কেক কাটা ইত্যাদি প্রথা। সৌদী আরব সহ আরব বিশ্বের ওলামায়ে কেরাম এগুলোকে বেদআত ও কুসংস্কার বলেন। তাদের যুক্তি হল, রাসূলুল্লাহ (স) সহ সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তাবয়ে' তাবেঈদের সর্বোত্তম যুগে এগুলো পালন করা হয়নি। অথচ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ـ

"আমার যুগ হল সর্বোত্তম, তার পরের যুগ (তাবেঈদের যুগ) এবং তার পরের যুগও (তাবেয়ে' তাবেঈদের যুগ) সর্বোত্তম।"

অথচ তাঁরাও বিয়ে-শাদী করেছেন, তাদেরও জন্ম ও মৃত্যু দিবস ছিল। এগুলো পালন করা যদি উত্তম হত কিংবা কল্যাণকর হত, তাহলে মানবতার মুক্তিদূত মহানবী (স) তা নিজে করতেন এবং সাহাবায়ে কেরাম সহ পরবর্তী যুগের মুসলমানদেরকে তা করার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু হাদীসে তার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। তিনি যেখানে ঘুম-বিশ্রাম, পেশাব-পায়খানা ও খাওয়া-দাওয়ার মত ছোটখাট জিনিসগুলোর নিয়ম-পদ্ধতি পর্যন্ত বলে গেছেন, সেখানে তুলনামূলকভাবে এ ধরনের বড় কাজগুলো সম্পর্কে চুপ থাকতেন না। বরং তিনি সাবধান করে গেছেন ঃ

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ـ

"যে আমাদের দীনের মধ্যে নতুন কিছু চালু করে, যা আমাদের দ্বারা প্রবর্তিত নয়, তা বাতিল।"–বুখারী, মুসলিম

আমাদের সমাজে ধর্মীয়-রীতি প্রথায়ও এ জাতীয় বহু বেদআত অনুপ্রবেশ করেছে। যেমন মিলাদ, লোক রেখে ভাড়ায় কুরআন খতম করানো, মাজার পূজা, ওরস, মাজারে ঘর বা বিল্ডিং তৈরি করা ইত্যাদি। এগুলোর বিরুদ্ধেও

উপরে বর্ণিত যুক্তি প্রযোজ্য। মহানবী (স) আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ

ايَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَانَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ -

"তোমরা দীনের মধ্যে নতুন কোনো কিছু সংযোজনের ব্যাপারে সাবধান থাক। কেননা, প্রত্যেকটি নতুন সংযোজনই বেদআত, প্রতিটি বেদআত গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহীর ঠিকানা হচ্ছে, দোজখ।"–(াবু দাউদ, তিরমিজী, এটাকে হাসান, সহীহ্ বলেছেন।

ইসলাম যেসব পর্বগুলো আমাদেরকে পালন করতে বলেছে, আমরা যদি তা যথার্থভাবে পালন করি, তাহলে মুসলমানদের উৎসবের সংখ্যা অন্য যে কোনো জাতির চেয়ে বেশী হবে।

রোযার ঈদ উদ্‌যাপনের আগে গোটা রমযান মাসকে উৎসব হিসেবে গ্রহণ করা যায়। লোকদেরকে ইফতার করানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সমাবেশ, রমযান সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা, কদরের রাত পালন এবং সে উপলক্ষে এর তাৎপর্যের উপর আলোচনা, কুরআন নাযিলের ঘটনা, কুরআন সম্পর্কে আলোচনা এবং কুরআনকে মানব জীবনের আইন-বিধান হিসেবে প্রমাণ করা যায়। রমযান শেষে শাওয়াল মাসের ৬ রোযার গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা এবং শাওয়ালের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। এরপর আসে হজ্জ। হজ্জ ইসলামের আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এ সম্মেলনের লক্ষ্য বহুমুখী। বিশ্ব মুসলিমের অবস্থা বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দীনের দাওয়াত ও প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা করে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা এর অন্যতম লক্ষ্য। যদিও বাস্তবে তা হচ্ছে না। হজ্জকে তার যথার্থ লক্ষ্য সহকারে আদায় করতে পারলে বিশ্বের মুসলিম সমাজগুলোর অবস্থার প্রভূত উন্নতি হত।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে রমযান ও রমযানের ঈদ হচ্ছে মুসলিম সমাজের সংশোধন ও আনন্দের আভ্যন্তরীণ পর্ব, আর হজ্জ হচ্ছে, আন্তর্জাতিক পর্ব। আমরা বর্তমান বিশ্বে দেখতে পাই, ভ্যাটিকান সিটিতে খৃস্টান ক্যাথলিকরা আন্তর্জাতিক সম্মেলন করে, ইহুদীরা করে যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যাণ্ডে, আর বৃহৎ শিল্পোন্নত দেশগুলো জি-৮ এর নামে সম্মেলন করে নিজেদের গোটা বিশ্বের জন্য বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে। একমাত্র মুসলমানেরাই এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। না হজ্জের এ সম্মেলনকে সফল করা হয়। আর না সফল করা হয় মুসলিম দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনকে। তাতে কিছু

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্বল প্রস্তাব গ্রহণ করেই নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা চলে। আজ মুসলিম বিশ্বে দরকার এমন এক নেতার যিনি সবার ইমাম হতে সক্ষম হবেন। তাহলেই তিনি মুসলিম মিল্লাতকে এগিয়ে নিতে পারবেন।

এরপর রয়েছে দশই মুহরম আশুরা পর্ব। এ পর্বের শিক্ষা ও তাৎপর্য আলোচনা করে আমরা নব জীবন লাভ করতে পারি। সর্বশেষে রয়েছে সাপ্তাহিক ঈদ জুমাবার। গতানুগতিকভাবে নয়–বরং বিপ্লবী দৃষ্টিকোণ থেকে এ দিবসকে কেন্দ্র করে মসজিদ ভিত্তিক বহু কাজ করা যায়।

৭. সাহিত্য-সংস্কৃতি ঃ সমাজের মানুষ সাহিত্যামোদী ও সংস্কৃতি প্রিয়। তাদের এ চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এগুলোতে সমাজের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট রয়েছে। বর্তমান যুগে ব্যাপক প্রচারযন্ত্র ও গণ মাধ্যমের কারণে সাহিত্য-সংস্কৃতির ভূমিকা অত্যধিক ব্যাপক। রেডিও, টেলিভিশনে, নাটক, গান, একাংকিকা সহ বহু সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচী প্রচারিত হয়। পত্র-পত্রিকায়, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি নিয়মিত ছাপা হয়।

এছাড়াও দেশে রয়েছে বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জোট ও গোষ্ঠী। সিনেমা, অডিও, ভিডিও-এর ভূমিকাও অপরিসীম। যুবক-যুবতীরা সর্বদা এগুলো নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এসব কারণে তাদের লেখা-পড়া এবং বিভিন্ন কাজকর্মও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্বল ঈমানের যুবক-যুবতীদের অনেকেই এগুলোতে ব্যস্ত থাকার কারণে নামায ছেড়ে দেয়, কুরআন পড়ার সময় পায় না ইত্যাদি। আরও কত কিছু। এমন কোনো সমাজ নেই, যে সমাজে এসব তৎপরতা নেই।

স্বয়ং মহানবীর সমাজেও কবিতা আবৃত্তি এবং সাহিত্য চর্চা ছিল। খেলা-ধূলা এবং সঙ্গীত চর্চাও ছিল। তিনি এগুলোকে লাগামহীন ছেড়ে দেননি, এগুলোর ইসলামীকীকরণ করেছেন। তিনি বল্গাহীন সাহিত্য চর্চা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দিয়ে এগুলোকে উদ্দেশ্যমূলক করেছেন। তিনি নাচ, বাজনা, অনৈসলামী ও অশ্লীল গান ও সাহিত্য চর্চা হারাম করেছেন। আজকের যুব সমাজকে সাহিত্য-সংস্কৃতির ময়দানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

৮. বৃহত্তর অর্থে সমাজ মানে দেশ ঃ আমরা ইতিপূর্বে যেসব উপাদানের সমন্বয়ে সমাজ গঠিত, সেগুলোর গুরুত্ব এবং আমাদের করণীয় কি, তা সংক্ষেপে ইঙ্গিত করেছি। এবার আমরা গোটা দেশে বিদ্যমান মুসলিম সমাজের সংশোধনের বিষয়ে আলোচনা করবো। দেশের যুব সমাজকে এ ব্যাপারে বিরাট

দায়িত্ব পালন করতে হবে। গোটা দেশ বা সমাজকে পরিবর্তন করতে হলে সামাজিক উপাদানগুলোতে আদর্শিক পরিবর্তন চাই, চাই পুরো পরিবেশের পরিবর্তন। এ পরিবর্তন একটি জটিল প্রক্রিয়া। বিভিন্ন মতাদর্শের সমাজ পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া রয়েছে।

সমাজতন্ত্র ব্যক্তি মালিকানা উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রীয় মালিকানার ব্যবস্থা হাতে নিয়ে বলেছে, এর মাধ্যমে সমাজের বুর্জোয়া ও ধনিক শ্রেণীর শোষণ বন্ধ হবে এবং প্রলেতারিয়েত বা শ্রমিক শ্রেণী তাদের ন্যায্য অধিকার পাবে। তারা গরীবদেরকে ধনীদের শোষণ থেকে রক্ষা করতে গিয়ে রাষ্ট্রের সেবাদাসে পরিণত করে আরো বেশী সমস্যায় ফেলেছে। ইনসাফ সেখানে অনুপস্থিত থাকায় সংকটের সমাধান হয়নি।

ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লব সহ অন্যান্য বিপ্লবের রয়েছে নিজ নিজ পদ্ধতি। সামরিক বিপ্লবেরও রয়েছে ভিন্ন পদ্ধতি। এ সকল পদ্ধতির মূল কথা হল এগুলোর সাথে সাধারণ জনগণ সম্পৃক্ত নয় এবং তার দরকারও নেই। সমাজের ধনিক ও প্রভাবশালী শ্রেণী এবং কায়েমী-স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর সমন্বয়ে ও স্বার্থে সকল পরিবর্তন এসেছে।

ইসলাম হচ্ছে এর ব্যতিক্রম। মহানবী (স) জনগণের মধ্যে ইসলামের ব্যাপক দাওয়াত, সংশোধন, তৎপরতা ও প্রশিক্ষণের পর তাদেরই ইচ্ছা ও সন্তোষ মোতাবেক ইসলামী সমাজ কায়েম করেছেন। তাতে ধনিক শ্রেণী কিংবা শাসক ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থ সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। বরং সকল মানুষের স্বার্থে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اَلنَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَاسْنَانِ الْمُشْطِ لاَفَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِى وَلاَ لِاَبْيَضَ عَلَى اَحْمَرَ اِلاَّ بِالتَّقْوٰى -

"মানুষ চিরুনীর দাঁতের মত সমান। অনারবের উপর আরবের কিংবা লালের উপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। পার্থক্য হবে শুধু তাকওয়ার ভিত্তিতে। এই হচ্ছে, ইসলামের মাপকাঠি।"

সমাজের মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হলে সকল গণ-মাধ্যমের সাহায্য নিতে হবে। রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, অডিও, ভিডিও ক্যাসেট, পত্র-পত্রিকা, ওয়াজ-মাহফিল, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ইসলামী বই-পুস্তক

প্রকাশ করতে হবে। মসজিদ, মাদ্রাসার ব্যাপক ভূমিকা পালন, ইসলামী কলেজ, স্কুল ও কিণ্ডার গার্টেন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা অপরিসীম। দেশে অভিন্ন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে এবং ছাত্রদেরকে ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি জাগতিক শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষক এবং ছাত্রদের মাঝে এবং শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানীতি প্রণয়নকারী ব্যক্তিত্ব ও সংস্থাগুলোকে ইসলামের দাওয়াতের আওতায় আনতে হবে।

সমাজ থেকে অন্যায়, অসত্য এবং ইসলাম বিরোধী কাজগুলোকে প্রতিহত করতে হবে এবং মহিলাদের পর্দা সহকারে চলার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। নামাযের সময় সকল দোকান-পাট ও বাজার বন্ধ এবং রমজান মাসে দিনে সকল হোটেল রেস্তোরাঁ পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে।

সমাজ সংস্কারের জন্য অনৈক্য ও বিভেদ বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা যাবে না। ঐক্যই শক্তি। যারা ইসলামের প্রচার-প্রসার করেন, তাদের জন্য ঐক্য অত্যন্ত প্রয়োজন। কুরআন মুসলমানদের ঐক্যের উপর জোর দিয়ে বলেছে ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوْا ص - ال عمران : ١٠٣

"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩

এখানে আল্লাহর রজ্জু বলতে, কুরআন-হাদীসকে বুঝানো হয়েছে এবং এর ভিত্তিতেই ঐক্য আসবে।

কুরআন ঐক্যের আদেশ দিয়ে আরো বলেছে ঃ

اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط - الشورى : ١٣

"তোমরা আল্লাহর দীন কায়েম কর এবং তাতে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়ো না।"–সূরা আশ শূরা ঃ ১৩

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে ৭২টি দল জাহান্নামে যাবে এবং একটি মাত্র দল জান্নাতে যাবে। সে দলটি হচ্ছে, আমার সুন্নতের অনুসারী–আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত। (আলবানী আল আহাদীস আস সহীহাহ ২০৪নং হাদীস)।

এ হাদীসেও অনৈক্যকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। মুসলমান এক আল্লাহ, এক কিতাব ও এক কেবলার অনুসারী। তাই তাদের মধ্যে ঐক্য থাকা উচিত।

অনৈক্যকে নিষেধ করে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ - الانفال : ٤٦

"তোমরা ঝগড়া-বিবাদ কর না, তাহলে, ব্যর্থ হবে এবং তোমাদের শক্তি-সামর্থ নিঃশেষ হয়ে যাবে।"–সূরা আল আনফাল ঃ ৪৬

আল্লাহ অবিভক্ত মুসলিম উম্মাহর সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

"তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মাহ, যাদেরকে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিরোধের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০

গোটা মুসলিম সমাজকে অবিভক্ত একটি দল হিসেবে তা থেকে বেরিয়ে যাওয়াকে জাহেলিয়াতের মৃত্যু এবং জাহান্নামের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً -

"যে ব্যক্তি খলীফা বা ইমামের আনুগত্য না করে মুসলিম উম্মাহর আল-জামাআত থেকে বেরিয়ে যায়, তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।"
–মুসলিম

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِى النَّارِ "যে মুসলিম উম্মাহ থেকে আলাদা থাকে, সে জাহান্নামেও আলাদা থাকবে।"–তিরমিজি

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "মেষপালের শত্রু বাঘের ন্যায় মানুষের বাঘ শত্রু হল শয়তান। বাঘ সে মেষ শাবককে ধরে নিয়ে যায় যে একাকী বিচরণ করে কিংবা ঘাসের অন্বেষণে পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সাবধান, তোমরা দল ছেঁড়ে দুর্গম গিরিপথে যেয়ো না এবং তোমরা অবশ্যই দলবদ্ধভাবে সাধারণের সাথে থাকবে।"–আহমদ

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

وَانَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ عَنْ عُنُقِهِ اِلَّا اَنْ يُرَاجِعَ -

"যে ব্যক্তি আল-জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বেরিয়ে যায়, সে নিজ গর্দান থেকে ইসলামের রশিকে খুলে ফেলে যে পর্যন্ত না আবার তাতে প্রত্যাবর্তন করে।"–আহমদ, তিরমিজি

দ্বিধাবিভক্তি ও দলাদলির কারণে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হয়, যা উম্মাহর বিরাট ব্যর্থতা। তাই সকল দল ও মতের লোককে কুরআন ও হাদীসের অনুসরণের ভিত্তিতে এবং সাধারণ লক্ষ্যের আলোকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

ইসলামী সমাজের মূলনীতি

ইসলামী সমাজের কতকগুলো মূলনীতি আছে। এর ভিত্তিতে মুসলিম সমাজ গড়ে উঠে। এখন আমরা সেসব মূলনীতির মধ্য থেকে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি আলোচনা করবো।

১. ভ্রাতৃত্ব ঃ মু'মিনরা একে অপরের ভাই। আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ - الحجرات : ١٠

"মু'মিনরা একে অপরের ভাই ; তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে সমঝোতা করে দাও।"–সূরা হুজুরাত ঃ ১০

আবু মূসা আশআরী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا -

"এক মু'মিন আরেক মু'মিনের জন্য ইমারত স্বরূপ যা পরস্পর পরস্পরকে মুজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে।"–বুখারী, মুসলিম

২. সহানুভূতি ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَرَاعَىْ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمّٰى -

"রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন ঃ তুমি মুসলমানদেরকে পারস্পরিক দয়া-ভালবাসা এবং একের প্রতি অন্যের আকর্ষণে এমন দেখতে পাবে যেমন শরীরের অবস্থা হয়ে থাকে। শরীরের কোনো অংশ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে অপরাপর অংশও অস্বস্তি ও অনিদ্রায় তার সাথী হয়।"

–বুখারী, মুসলিম

৩. সহযোগিতা ঃ আল্লাহ বলেন ঃ

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ص ـ

"তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর এবং গুনাহ ও নাফরমানীর কাজে সহযোগিতা কর না।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ২

৪. নিজের জন্য যা পসন্দ করবে অন্যের জন্যও তাই পসন্দ করা

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لاَخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهِ ـ

"তোমাদের কেউ সে পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না। যে পর্যন্ত না সে নিজ ভাইয়ের জন্য তাই পসন্দ করবে যা নিজের জন্য পসন্দ করে।"

–বুখারী, মুসলিম

৫. অন্য ভাইয়ের সম্মান ও সম্পদ পবিত্র ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

كُلُّ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ـ

"প্রত্যেক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জত নষ্ট করা হারাম।"–মুসলিম

৬. সমাজ কল্যাণ ঃ সমাজ সেবার মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ও দুর্গত মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করা জরুরী। নবী করীম (স)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন ঃ

وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُّسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

"যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের কোনো সমস্যা বা বিপদ দূর করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার বিপদ ও সমস্যা দূর করবেন।"–বুখারী, মুসলিম

৭. দয়া করা ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ مَنْ لاَيَرْحَمْ لاَيُرْحَمْ "যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না।"–বুখারী

অন্য এক হাদীসে আছে ঃ

اِرْحَمْ مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمْكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ ـ

"যমীনের উপর যারা আছে তাদের প্রতি দয়া কর, তাহলে, আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের উপর দয়া করবেন।"

৮. ধোঁকাবাজী করা যাবে না : রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا "যে আমাদের সাথে ধোঁকাবাজী ও প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"–মুসলিম

৯. কারো ক্ষতি করা যাবে না : মহানবী (স) বলেছেন : لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْاِسْلَامِ "ইসলামে কাউকে ঠকানো যাবে না এবং ঠকাও যাবে না।"–আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

১০. উপদেশ : সকলকে সদুপদেশ দিতে হবে। মহানবী (স) বলেছেন : اَلدِّيْنُ اَلنَّصِيْحَةُ "দীন হচ্ছে, উপদেশ।"

এখানে মাত্র কিছু মূলনীতি বর্ণনা করা হল। আরো অনেক মূলনীতি আছে যেগুলোর আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। এখানে শুধু একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হল।

চার. রাষ্ট্র সংশোধন

মানব সভ্যতায় রাষ্ট্র সরকারের ভূমিকা অপরিসীম। রাষ্ট্রের উপাদান। ১. জনসমষ্টি ২. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ৩. সরকার ৪. সার্বভৌমত্ব। আল্লাহ্ জনসমষ্টিকে কেন সৃষ্টি করেছেন এবং কি তাদের কাজ ? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ۝ ـ الذريات : ٥٦

"আমি মানুষ এবং জিনকে কেবলমাত্র আমার ইবাদাতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।"–সূরা আয-যারিয়াত : ৫৬

ভূখণ্ডও আল্লাহর তৈরি। তিনি তা এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যেন মানুষ তাতে বসবাস, আয়-রোজগার, খাদ্য উৎপাদন, কৃষি-শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং আরাম-বিশ্রাম করতে পারে। তিনি বলেছেন :

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهَادًا ۝ ـ النبا : ٦

"আমি কি জমীনকে সমতল বিছানা করিনি ?"–সূরা আন নাবা : ৬

তিনি আরো বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِزْقِهِ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ- الملك : ١٥

"তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন। অতএব, তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।"–সূরা মুলক ঃ ১৫

সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। মানুষ জমীনে তাঁর প্রতিনিধি বা খলীফা। প্রতিনিধির কাজ হলো, মূল ক্ষমতার মালিকের আদেশ-নিষেধ মেনে তার যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করা। প্রতিনিধি কখনও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হতে পারে না। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ- الجاثية : ٢٧

"এবং আসমান ও যমীনের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব আল্লাহরই জন্য।"
–সূরা আল জাসিয়া ঃ ২৭

তিনি আরো বলেন ঃ

اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ- الانعام : ٥٧

"শাসন ও আইন-বিধানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই।"
–সূরা আল আনআম ঃ ৫৭

মানুষের কাজ হলো, আল্লাহর বিধান ও আইনকে বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেরা মিলে আল্লাহর আদেশ বা নিষেধকে বাতিল করতে পারবে না, তাদেরকে সে ক্ষমতা দেয়া হয়নি। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ- احزاب : ٣٦

"আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যখন কোনো ফয়সালা জারী করেন, তখন তা না মানার ব্যাপারে কোনো মু'মিন পুরুষ বা নারীর এখতিয়ার নেই।"
–সূরা আল আহযাব ঃ ৩৬

প্রত্যেক রাষ্ট্রে সরকার রয়েছে। তারাই দেশ চালায়। সরকারের কাজকে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ১. আইন প্রণয়নের জন্য আইন পরিষদ, ২.

বিচার কাজ চালানোর জন্য বিচার বিভাগ এবং ৩. প্রশাসন চালানোর জন্য প্রশাসনিক বিভাগ।

মুসলমানের দেশে ইসলামের খেলাফত ব্যবস্থা চালু করতে হবে। কোরআন এবং সুন্নাহ হবে সে দেশের শাসনতন্ত্র। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষাব্যবস্থাসহ সবকিছু ইসলামের আলোকে পরিচালিত করতে হবে। সরকারের প্রধান তিনটি বিভাগকেই অর্থাৎ আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও প্রশাসনিক বিভাগকে ইসলামের পথনির্দেশ মেনে চলতে হবে।

সরকারকে ইসলামী হতে হবে। নচেত কেউ সত্যিকার মুসলমান হতে পারে না। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○ - المائدة : ٤٤

"যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা কাফের।"
–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৪

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ - المائدة : ٤٥

"যারা আল্লাহর অবতীর্ণ আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা যালেম।"
–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৫

তিনি আরো বলেন ঃ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○ - المائدة : ٤٧

"যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা ফাসেক।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৭

এ তিন আয়াতে, আল্লাহর আইন, কুরআন ও হাদীসের বিধান তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন না করলে সেটাকে কুফরী, যুলুম ও ফাসেকী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ্ নিজেই সেখানে রাষ্ট্রে ও সরকারে ইসলামী আইন কায়েম না করাকে কুফরী, যুলুম ও ফাসেকী বলেছেন, সেখানে একজন মু'মিনকে মু'মিন হতে হলে, দেশে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা এবং কুরআন ও হাদীসের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। তা না হলে, তিনি কিভাবে মু'মিন হতে পারলেন ? আর সে জন্য মু'মিনের ইসলামী রাজনীতি থেকে দূরে থাকা শয়তানী ওয়াসওয়াসা ছাড়া আর কিছু নয়। রাসূলুল্লাহ (স)

বলেছেন ঃ اَلْمُلْكُ وَالدِّيْنُ تُوْأَمَانِ "রাজনীতি এবং দীন জমজ সন্তানের মত অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। একটাকে আরেকটা থেকে আলাদা করা যাবে না।"

একটি প্রবাদ আছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَالاَ يَزَعُ بِالْقُرْاٰنِ -

"আল্লাহ্ সরকার দ্বারা এমন কিছু প্রতিহত করেন যা কুরআন দিয়ে পারা যায় না।"-ইবনে কাসীর-আল বেদায়া ওয়ান্ নেহায়া, ২য় খণ্ড, ১০ম পৃঃ।

অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগের মাধ্যমেই কেবল তাঁর দীন কায়েম হতে পারে। সরকারী ক্ষমতার প্রয়োগ ছাড়া আল্লাহর দীন কায়েম করা সম্ভব নয়।

সরকারী প্রশাসনের কর্মকর্তাদেরকে সেবকের চরিত্র গ্রহণ করতে হবে। তারা উম্মাহর সেবক। তারা সুষ্ঠুভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন। তাদেরকে নিজ নিজ দায়িত্বের জবাবদিহি করতে হবে। এ মর্মে মহানবী (স) বলেছেন ঃ

اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْاِمَامُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلُ عَنْ رَّعِيَّتِهِ -

"জেনে রাখ, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। প্রত্যেককে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধানকে অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।"–বুখারী, মুসলিম

প্রত্যেক কর্মচারী ও কর্মকর্তাকে বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাদেরকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। তাই তাদেরকে নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে। এজন্য তারা ঘুষ নিতে পারবে না। মহানবী (স) বলেছেন ঃ اَلرَّاشِىْ وَالْمُرْتَشِىْ فِى النَّارِ "ঘুষদাতা এবং ঘুষখোর জাহান্নামী।"

ইসলামী সরকারের জন্য আইন পরিষদ হচ্ছে, মজলিশে শুরা। মজলিশে শুরার কাজ হল, কুরআন ও সুন্নাহর আইন সমাজে বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও উপায় বের করা এবং বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধানের চেষ্টা করা। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রের জন্য রয়েছে পার্লামেন্ট। সে পার্লামেন্ট সার্বভৌম। সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে তা দেশের জন্য আইন তৈরি করে। আইন ইসলাম বিরোধী হলে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। যেহেতু গণতন্ত্র ইসলামী পদ্ধতি নয়।

গণতন্ত্রের মত ইসলামেরও রয়েছে মজলিশে শুরা। দু'টোর কাজকর্মের মধ্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পদ্ধতি এক এবং ইসলামী আন্দোলনের পদ্ধতি আরেক। এ ক্ষেত্রেও পার্থক্য রয়েছে।

ইসলামী সরকার দেশে ইসলামী অর্থনীতি চালু করবে। মানুষের রুজী-রোজগার হালাল হওয়ার জন্য ইসলামী অর্থনীতির বিকল্প নেই। রোজগার হালাল না হলে, কোনো ইবাদাত কবুল হবে না। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সুদ-ঘুষের কোনো সুযোগ থাকবে না। সুদ হচ্ছে শোষণের হাতিয়ার, ইসলাম সকল প্রকার শোষণ বন্ধ করে দেয়।

ইসলামী অর্থনীতি কায়েম করলে দেশে কোনো অভাব-অনটন থাকে না। খলীফা ওমর বিন আঃ আযীযের সোনালী শাসন তার প্রমাণ। তিনি যাকাত সংগ্রহ করে গরীব মুসলমানদের মধ্যে বণ্টনের নির্দেশ দেন। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি কায়েমের বরকতে দেশে কোনো গরীব মানুষ অবশিষ্ট নেই। ফলে, ঐ অর্থ গরীব অমুসলমানের মধ্যে বণ্টনের নির্দেশ দেন। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতির সুফলে তাদের দারিদ্র্যও দূর হয়ে গেছে। কোনো গরীব না পেয়ে তিনি আল্লাহর কাছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার শুকরিয়া আদায় করেন।

ইসলামী অর্থ ও শাসন ব্যবস্থা কায়েম করলে দেশে কোনো অভাব-অনটন ও খরা, দুর্ভিক্ষ থাকে না। আমরা আল্লাহর এ বাণী ও প্রতিশ্রুতি কওমে নূহের প্রতি হযরত নূহ (আ)-এর জবানী শুনতে পাই। আল্লাহ বলেন ঃ

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًاo يُّرْسِلِ السَّمَاۤءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًاo

وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا o

"অতপর আমি বলেছি ঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে গুনাহ মাফ চাও। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দেবেন। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দেবেন, তোমাদের জন্য বাগান সৃষ্টি করবেন এবং নদীমালা প্রবাহিত করবেন।"

–সূরা আন নূহ ঃ ১০-১২

দেশের মুসলিম শাসকদের অন্যতম কাজ হলো, নামায কায়েম করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ـ الحج : ٤١

"আমি যাদেরকে যমীনে ক্ষমতা দিয়েছি, তারা নামায কায়েম করে।"

রাজনীতিকে ইসলাম বহির্ভূত মনে করা কুফরী আকীদা। কোনো মুসলমান যেন এ বিরাট ভুল না করেন। ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন মুসলিম দেশে বাস্তবায়ন করতে হবে। তবে মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের পদ্ধতি কি হবে-তা নিয়ে।

১১. দীন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি

মহানবী (স)-এর দীন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির দিকে তাকালে দেখা যায়, তিনি মক্কী জীবনে ইসলামের সূচনার যুগে লোকদের মধ্যে ব্যাপক দাওয়াতী ও প্রশিক্ষণমূলক কাজ করেছেন। আর মাদানী জিন্দেগীতে দীন কায়েম করেছেন। এটাতো হল, অমুসলিম সমাজে দীন কায়েমের পদ্ধতি। মুসলিম সমাজে যেখানে আল্লাহর দীন কায়েম নেই, সেখানে দীন কায়েমের পদ্ধতি কি হবে ? মাক্কী জীবনের পদ্ধতি না মাদানী জীবনের পদ্ধতি ?

এ জটিল প্রশ্নের সমাধানে ওলামায়ে কেরামের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গী জানা দরকার। সকল মতের আলেমদের দৃষ্টিতে সর্বাবস্থায় দাওয়াতী কাজ, উপদেশ ও নসীহত অব্যাহত রাখতে হবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ধারাও অব্যাহত থাকতে হবে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী আলেমদের মতে, মুসলিম শাসক জালেম হলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। তাকে অব্যাহত উপদেশ দিতে হবে এবং ওয়াজ-নসীহত করতে হবে যদি সে ইসলামকে অস্বীকার না করে। কেননা, জোরপূর্বক ক্ষমতা পরিবর্তনের চেষ্টা চালালে, আরো বেশী ফেতনা ও গোলযোগ সৃষ্টি হবে। ক্ষমতা পরিবর্তনের জন্য শক্তি প্রয়োগ করলে তা হতে বাধ্য। শাসকের ফেতনার চেয়ে যদি এ পদ্ধতিতে হত্যা, বিশৃংখলা ও গোলযোগ বাড়ে, তাহলে বেশী ফেতনা অপেক্ষা কম ফেতনা ভাল।

মুসলিম শাসক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি উপদেশ ও কল্যাণ কামনার আকারে জিহাদের কার্যক্রম চালাতে হবে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، قُلْنَا لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰه ؟ قَالَ : لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهٖ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ -

"দীন ইসলাম হচ্ছে সৎ উপদেশ ও কল্যাণ কামনার নাম। সাহাবাগণ বলেন, তখন আমরা জিজ্ঞেস করলাম—তা কার জন্য করা হবে হে রাসূলুল্লাহ ? তিনি বলেন ঃ আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ লোকদের জন্য।"–মুসলিম

রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেছেন, 'যালেম শাসকের সামনে সত্য ও হক কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।'-(আবু দাউদ, তিরমিযী)। অর্থাৎ জালেম শাসকদের কাছে বাকশক্তি দিয়ে এবং হক কথা বলে সর্বোত্তম জিহাদের দায়িত্ব আনজাম দিতে হবে। তাদের সন্তোষ-অসন্তোষের তোয়াক্কা না করে আল্লাহকে খুশী করার চেষ্টা করতে হবে।

ফাসেক ও পাপী লোকদের পরিবর্তনের জন্য নিম্নোক্ত জিহাদী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

> "তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে তাহলে হাত দ্বারা তা প্রতিরোধ করবে ; তা সম্ভব না হলে বাকশক্তি দ্বারা এর বিরোধীতা করবে ; তাও সম্ভব না হলে ঐ কাজকে অন্তর থেকে ঘৃণা করবে। আর এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম স্তর।"-মুসলিম

ইমাম আহমদকে যখন 'কুরআন সৃষ্ট কিনা' এ মতবাদের সমর্থন না করায় জেলে আটক করে নির্যাতন চালানো হয় তখনও তিনি ক্ষমতাসীন মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে অধিকতর ফেতনা সৃষ্টির ভয়ে বিদ্রোহের বা গোলযোগের আহ্বান জানাননি। অথচ, এ ব্যাপারে তাঁর একটু ইশারাই যথেষ্ট ছিল এবং তাঁর অনুসারীরা এরই অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি নির্যাতনের পর নির্যাতনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন, তথাপি মুসলিম সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টিকে জায়েয মনে করেননি।

একই দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে, অতীতের অন্যান্য সকল বড় বড় ইমাম ও আলেমগণ ধ্বংসাত্মক ও গোলযোগপূর্ণ পদ্ধতিকে দীন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেননি। তাঁরা মহানবীর আমল থেকেই দীন কায়েমের শান্তিপূর্ণ ধারায় বিশ্বাসী। তাঁরা দীন কায়েমের পথে গোলযোগ, হত্যা, মারামারি-কাটাকাটি, বিরোধ-বিসম্বাদ ও ফেতনা সৃষ্টিকে অপসন্দ করেছেন এবং যে পদ্ধতি গ্রহণ করলে এগুলোর আশংকা রয়েছে, সে পদ্ধতি থেকেও দূরে ছিলেন।

যে মুসলিম সমাজে দীন কায়েম নেই সেখানে দীন কায়েমের পদ্ধতির ব্যাপারে প্রখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কুরআনে সূরা হুজুরাতের ১০ আয়াতের তাফসীরে যা বর্ণিত হয়েছে তাহলো ঃ

সাধারণ ফেকাহবিদ ও হাদীসবিদদের মত হলো, একবার যে রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার ব্যবস্থাপনাধীন রাষ্ট্রের আইন-শাসন এবং নিয়ম-শৃংখলা যদি কার্যকরভাবে চলে, তাহলে সে রাষ্ট্রপ্রধান সুবিচারক ও ন্যায়পরায়ন হোক কিংবা জালেম-অত্যাচারী হোক এবং তার কর্তৃত্ব যেভাবেই

প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম। কিন্তু সে যদি প্রকাশ্য কুফরী করে তাহলে তার ক্ষমতার মসনদ উল্টিয়ে দেয়ার জন্য বিদ্রোহ করা বৈধ। হানাফী ইমাম সারাখসী লিখেছেন, যদি মুসলিম জনগণ একজন রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়, তার কারণে তারা শান্তি ও নিরাপত্তা এবং রাস্তাঘাটে নির্বিঘ্নে চলাচলের নিশ্চয়তা লাভ করে, তাহলে ঐ শাসকের বিরোধীতাকারী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত সামর্থবান লোকদের উপর সরকারের পক্ষে যুদ্ধ করা কর্তব্য।—আল মাবসুত বাব আল খাওয়ারিজ।

ইমাম নওয়ী (র) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হারাম, সে যদি ফাসেক এবং জালেমও হয়।' তিনি দাবী করেছেন যে, এ মতের উপর ইজমা বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।'

আসলে এ ইজমার দাবী যথার্থ নয়। ইসলামের বড় বড় ফেকাহবিদ ও ওলামায়ে কেরামের মতে, ন্যায়পরায়ন ও সুবিচারপন্থী ইমাম বা শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই তাকে বিদ্রোহ এবং ঐ লোকদেরকে বিদ্রোহী বলা হবে। তাঁরা জালেম ও ফাসেক শাসকদের বিরুদ্ধে সৎ ও নেক লোকদের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোকে কুরআন মজীদের পরিভাষা অনুযায়ী বিদ্রোহ বলতে প্রস্তুত নন। বরং তাঁরা জালেম শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে 'ওয়াজিব'ও বলেন না।

ইমাম আবু হানিফা (র) জালেম শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করার ব্যাপারে কি মত পোষণ করতেন তা অভিজ্ঞ মহলের অজানা নয়। আবু বকর আল জাসসাস তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'আহকামুল কুরআনে' স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা (র) এরূপ যুদ্ধকে কেবল জায়েয ও বৈধই বলেননি, বরং অনুকূল অবস্থায় একে ওয়াজিবও ঘোষণা করেছেন।—১ম খণ্ড, ৮১ পৃষ্ঠা, ২য় খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা।

তিনি বনী উমাইয়ার বিরুদ্ধে জায়েদ বিন আলীর মাথা তুলে দাঁড়ানোর (বিদ্রোহের) ব্যাপারে নিজে কেবল অর্থ সাহায্য দিয়েই ক্ষান্ত হননি, অন্যান্য লোকদেরকেও তা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন।—(আল জাসসাস ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮১)। এছাড়াও তিনি খলীফা মনসুরের বিরুদ্ধে 'নফসে জাকিয়ার' মাথা তুলে দাঁড়ানোর সময় নফসে জাকিয়াকে পূর্ণ সাহায্য-সমর্থন করেছেন এবং তিনি ঐ যুদ্ধকে 'কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের তুলনায় অধিক উত্তম বলে

ঘোষণা করেন।'-আল জাসসাস, ১ম খণ্ড, ৮১ পৃষ্ঠা মানাকেবে আবু হানিফা আল কারাঅরী, ২য় খণ্ড, ৭১-৭২ পৃষ্ঠা।

তাছাড়া ইমাম সারাখসী যা লিখেছেন, তা হানাফী মাযহাবের ফেকাহবিদের অভিন্ন মত নয়।

ইবনে হাম্মাম হেদায়ার ব্যাখ্যা 'ফাতহুল কাদীর' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

اَلْبَاغِىْ فِىْ عُرْفِ الْفُقَهَاءِ اَلْخَارِجُ عَنْ طَاعَةِ اِمَامِ الْحَقِّ -

"ফেকাহবিদদের পরিভাষা অনুযায়ী সত্যপন্থী ন্যায়পরায়ণ মুসলিম রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য অমান্যকারীকেই বিদ্রোহী বলা হয়ে থাকে।"

অপরদিকে, হাম্বলী মাযহাবের ইবনে আকীল ও ইবনুল জাওজী অন্যায়পন্থী শাসকের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোকে বৈধ বলে অভিহিত করেছেন। এর প্রমাণ হিসেবে তাঁরা ইয়াজিদের বিরুদ্ধে ইমাম হুসাইনের বিদ্রোহের উদাহরণ পেশ করেন।

ইমাম শাফেঈর 'কিতাবুল উম্ম' গ্রন্থে 'বিদ্রোহী' বলে সে ব্যক্তিকে অভিহিত করা হয়েছে, যে সুবিচারবাদী ও ন্যায়পন্থী শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।-৪র্থ খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা।

আল-মোদাওয়ানা গ্রন্থে ইমাম মালেকের মত উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁর মতে, বিদ্রোহীরা যদি সুবিচারবাদী শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হয়, তবে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে হবে।-১ম খণ্ড, ৪০৭ পৃঃ

কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী তাঁর 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে নিজ মত প্রকাশ করে বলেছেন ঃ

কেউ যদি ওমার বিন আবদুল আযীযের মত কোনো ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় তবে তার প্রতিরোধ ও দমন ওয়াজিব। কিন্তু অন্য কোনো ধরনের শাসকের বিরুদ্ধে হলে সেটাকে স্ব-অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে। আল্লাহ্ অপর কোনো জালেম দ্বারা তাকে শাস্তি দেবেন এবং পরে তৃতীয় কোনো জালেম দ্বারা এ দুজনকেও শাস্তি দেবেন।

তিনি ইমাম মালেকের আরেকটি বক্তব্যেরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাহলো, কোনো একজন শাসকের হাতে বাইয়াত ও আনুগত্যের শপথের পর যদি তার বিরুদ্ধে তার কোনো মুসলমান ভাই দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে, বিদ্রোহী ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে যদি সে শাসক ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারপন্থী হন। কিন্তু

আমাদের কালের শাসকদের কথা আলাদা। তাদের জন্য কোনো বাইআত ও আনুগত্য নেই। কেননা, এ আনুগত্যের বাইআত জোরপূর্বক নেয়া হয়েছে।

তাফহীমুল কুরআনের এ দীর্ঘ আলোচনায় দীন কায়েম ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যমে তাকে পরাজিত করে দীন কায়েমের চেষ্টার ব্যাপারে আমরা বড় বড় আলেম ও ফেকাহবিদদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গী জানতে পারলাম। এ আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম, অধিকাংশ ফকীহ, জালেম শাসককে উৎখাত করে ন্যায় ও সত্যপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠাকে জরুরী বলেছেন এবং এ লক্ষে পরিচালিত আন্দোলন ও কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে, তারা ভাল ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন ও বিপ্লবকে সমর্থন করেননি।

এ সকল ফকীহ যে যুগের লোক ছিলেন সে যুগে অর্থাৎ উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে রাজতন্ত্র ছাড়া দেশের অধিকাংশ আইন-কানুন ও ব্যবস্থা ছিল ইসলামী। তা সত্ত্বেও তারা অন্যায় শাসকের বিরুদ্ধে বিপ্লবকারীদের প্রতি সাহায্য-সমর্থনের আহ্বান জানিয়েছেন। বর্তমান যুগে মুসলিম দেশগুলোতে দু-একটা দেশ ছাড়া অন্যান্য দেশগুলো রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে দীনকে নির্বাসন দিয়েছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে দীন কায়েম সম্ভব হলে ভাল। সে লক্ষে আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে। তা না হয়, বিপ্লব-বিদ্রোহ ও গণঅভ্যুত্থান হলো বিকল্প পদ্ধতি।

মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে শরীয়তের যে বিধান রয়েছে সূরা হুজুরাতের ৯ আয়াতটিই এর মূল ভিত্তি। একটি মাত্র হাদীস ছাড়া রাসূলে করীম (স)-এর সমগ্র সুন্নাতে এ আইনটির কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কেননা, তাঁর জীবদ্দশায় মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের মত কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়নি। ফলে তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে এ প্রসঙ্গের আইনের কোনো ব্যাখ্যা না পাওয়াই স্বাভাবিক। পরবর্তীকালে এ আইনটির প্রমাণসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল তখন, যখন আলী (রা)-এর খেলাফত আমলে মুসলমানদের পরস্পরে লড়াই অনুষ্ঠিত হলো। তখন বিপুল সংখ্যক সাহাবী বর্তমান ছিলেন। এ কারণে তাঁদের আমল এবং তাদের বর্ণনা করা আইন হতে ইসলামী আইনের এ বিভাগের বিস্তারিত ব্যবস্থা রচিত হতে পারে। বিশেষ করে, আলী (রা)-এর আদর্শ কার্যক্রম এ পর্যায়ের সমস্ত ফেকাহবিদদের চিন্তা-ভাবনার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু।

আবু বকর সিদ্দীক (রা) যাকাত দিতে অস্বীকারকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন ঃ 'আল্লাহর কসম, যারা নামায

ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো।' তিনি একথা দ্বারা কুরআনে বহু স্থানে একত্রে বর্ণিত নামায ও যাকাতের বাধ্যবাধকতার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। যাকাত ইসলামের ৫ খুঁটির অন্যতম অর্থনৈতিক খুঁটি। এ একটা মৌলিক ফরযকে অস্বীকার করলে যদি যুদ্ধ করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে যে মুসলিম সমাজে ইসলামের এরূপ আরো বহু মৌলিক বিষয়কে অস্বীকার করা হয় সেখানেও যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

আল্লাহর আইন অমান্য করা কুফরী। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ـ

“যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মুতাবেক বিচার-ফায়সালা ও শাসন করে না তারা কাফের।”–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৪

আল্লাহর আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করা অবশ্যই বৈধ। আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ـ

“তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ না ফেতনা নির্মূল হয়ে যায় এবং দীন সম্পূর্ণ আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।”–সূরা আল আনফাল ঃ ৩৯

আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, এমন কোনো পদক্ষেপ যেন গ্রহণ করা না হয়, যার মাধ্যমে লোকদের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি করা হয়, যা দীন গ্রহণের পথে তাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ মুসলিম জনগণ ইসলামের বিরোধী নয়। কিন্তু দেখা যায় তারা বিভিন্ন ইসলামী দলের গৃহীত পদ্ধতি ও পদক্ষেপের বিরোধিতা করে। ফলে, তারা ইসলামপন্থীদের উপর বিরক্ত হয়ে দীন সম্পর্কে কিছু শুনতে ও গ্রহণ করতে আগ্রহী হওয়ার পরিবর্তে আরো দূরে সরে যায়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا “লোকদেরকে সুখবর দিয়ে এগিয়ে আন এবং ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী কাজ করে তাদেরকে দূরে ঠেলে দিও না।”–বুখারী

বিশেষ করে, দীন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে লোকদেরকে দীনের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে এবং ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে। রাজনৈতিক কর্মসূচীকে ন্যূনতম করতে হবে এবং দাওয়াত-তাবলীগ ও প্রশিক্ষণের কর্মসূচী জোরদার করতে হবে। রাজনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে গেলে নিম্নোক্ত পরিস্থিতিগুলো সৃষ্টি হয় যা ইসলামী দলগুলো না করলেও বিরোধী শক্তিগুলো তা সৃষ্টি করে থাকে।

ফলে ইসলামী দলগুলোকেও এর সাথে জড়িয়ে যেতে হয়। যেমন গালি-গালাজ, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ইত্যাদি। এ ব্যাপারে মহানবী (স) বলেছেন ঃ

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ـ

"মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং লড়াই করা কুফরী।"
—বুখারী ও মুসলিম

দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ করতে গিয়ে মারা ও মরা দু'টোই নাজায়েয। এ মর্মে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ ؟ قَالَ اِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ ـ

"যখন দু' মুসলমান তাদের তলোয়ার নিয়ে লড়াই করে, হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামে যাবে। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল ! হত্যাকারীর জাহান্নামী হওয়াতো যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেন জাহান্নামী হবে ? তিনি উত্তর দেন ঃ কেননা সেও নিজ ভাইকে হত্যা করতে লালায়িত ছিল।"—বুখারী

রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেছেন ঃ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ ـ

"সে-ই মুসলমান, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।"—বুখারী, মুসলিম

ইসলামকে অবশ্যই রাষ্ট্রে বিজয়ী দীন হিসেবে কায়েম করতে হবে। যে সমাজে যে সকল মানব রচিত মতবাদ বিদ্যমান আছে, তার উপর ইসলামকে বিজয়ী করতেই হবে। এ মর্মে আল্লাহ কুরআনে বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ـ التوبة : ٣٣

"তিনিই সে সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও দীনে হক দিয়ে পাঠিয়েছেন, যেন অন্যান্য সকল মতাদর্শের উপর ইসলামী জীবনাদর্শকে

বিজয়ী করেন। যদিও মোশরিকরা তা অপসন্দ করে।"

–সূরা আত তাওবা ঃ ৩৩

দীন কায়েমের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। দীন কায়েমের পর ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক তৎপরতা পুরোদমে চলবে। দীন প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত দরকার ব্যাপক জনতার কাছে তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত সহ মৌলিক আকীদার জোরদার দাওয়াত। বিরাট সংখ্যক লোক ইসলামী জীবনাদর্শের অনুসারী বা সমর্থক হয়ে গেলে দীন কায়েমের পথ সুগম হবে। কোন্ ভুখণ্ডে ও কোন্ দেশে কোন্ পদ্ধতিতে দীন কায়েম হবে তা বুঝা যাবে চূড়ান্ত মুহূর্তে। তাই বহু আগ থেকেই পদ্ধতি নির্ধারণ করা মুশকিল। মহানবী (স)-ও মদীনার দীন কায়েমের অগ্রিম পদ্ধতি নির্দিষ্ট করেননি কিংবা বলেননি। সময় সুযোগমত পরিবেশের উপযুক্ত সদ্ব্যবহারই কাম্য। আল্লাহ তার দীনকে বিজয়ী করবেনই। তিনি বলেছেন ঃ

اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝ - محمد : ٧

"তোমরা যদি আল্লাহর দীন কায়েমে সাহায্য কর, তিনিও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদমকে মজবুত করবেন।"

–সূরা মোহাম্মদ ঃ ৭

দীন কায়েমের জন্য ব্যাপক কাজ করাই কাম্য।

১২. দীন প্রতিষ্ঠার বিশেষ কর্মসূচী

দীন কায়েমের জন্য বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচী বিদ্যমান আছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু বিশেষ কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করলে দীন কায়েমের গতি ত্বরান্বিত হবে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. যোগ্যতা ও ক্যারিয়ার গঠন ঃ যোগ্যতা না থাকলে কোনো দাম নেই। ক্যারিয়ার গঠনের মাধ্যমে যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। যেমন, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, আমলা, সেনাধ্যক্ষ, পুলিশ অফিসার, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, পি. এইচ. ডি, মেকানিক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও আইনজীবি ইত্যাদি পেশাধারী লোকেরাই ক্যারিয়ার গঠন করেছে বলে ধরা হয়। তাই দীনি কাজে জড়িত লোকদেরকে এগুলো সহ অন্যান্য পেশাজীবি হতে হবে। তারাই জনগণকে বেশী প্রভাবিত করতে পারে। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

"পৃথিবী আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর মালিক করেন এবং শুভ পরিণাম আল্লাহভীরুদের জন্য।"–সূরা আরাফ ঃ ১২৮

এ আয়াতে আল্লাহভীরু লোকদেরকে দুনিয়ার শাসন ক্ষমতা দানের ওয়াদা করা হয়েছে। তাই যে কোনো ক্যারিয়ার গঠনের আগে বান্দাহকে আল্লাহভীরু হতে হবে।

২. ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ঃ যুগে যুগে দীন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই টিকে আছে। এ ক্ষেত্রে মসজিদ-মাদ্রাসার ভূমিকা অতুলনীয়। আলেম-ওলামারাই ইসলামকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। বর্তমান যুগে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, আরবী ভাষা ইনস্টিটিউট, ইসলামী কিণ্ডার গার্টেন ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যতবেশী সম্ভব তৈরি করা এবং মাদ্রাসাগুলোর গুণগতমান উন্নয়ন করা দরকার।

৩. সর্বশেষ যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার ঃ দীনের দাওয়াতী কাজের জন্য যুগের সর্বশেষ যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। অনৈসলামী শক্তি তাকে কাজে লাগিয়ে অন্যায়–অসত্যের গতিকে লক্ষগুণ জোরদার করেছে। ইসলামের পক্ষ থেকেও সমান প্রতিরোধ দরকার। কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে আজ বিশ্বব্যাপী বিরাট যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। ডিশ এন্টিনা, ইন্টারনেট, কম্পিউটার, টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র ইত্যাদির ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী। সাংবাদিকদের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে দাওয়াত দিতে হবে। এসব প্রযুক্তির কারণে বিশ্ব আজ একই পরিবারের রূপ নিয়েছে। এ সকল প্রযুক্তির মাধ্যমে আজ বিশ্বব্যাপী ইসলাম বিরোধী মতবাদসমূহের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে।

৪. বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস ও তাওহীদের ব্যাপক প্রচার ঃ এজন্য ইসলামী সাহিত্য, প্রচার মাধ্যম, ওয়াজ-নসীহত ও ব্যক্তিগত দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের মন-মগজকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। মানুষের মন-মানসিকতা থেকে বেদআত ও কুসংস্কার দূর না করে এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সঠিক ধ্যান-ধারণা না দিতে পারলে জনগণকে ইসলামের পক্ষে আনা যাবে না। সকল নবী-রাসূল প্রথমে মানুষের আকীদা-বিশ্বাস সংশোধন করেছেন। তারপর তাদেরকে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিবর্তনের সহায়ক শক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন।

৫. ব্যাপক সাংস্কৃতিক তৎপরতা ঃ আজকের যুগ হচ্ছে সাংস্কৃতি চর্চার যুগ। মানুষ সাংস্কৃতিক তৎপরতার মাধ্যমে আদর্শ ও মতবাদ গ্রহণ করতে চায়। তাই ইসলামী গান, নাটক, খেলা-ধূলা ইত্যাদির আয়োজন করতে হবে। আজকাল এগুলোর মাধ্যমে দাওয়াতী কাজের প্রভাব বেশী পড়ে।

৬. ব্যাপক সমাজ সেবামূলক কাজ ঃ সমাজ সেবার মাধ্যমে দুঃস্থ ও সমস্যাগ্রস্থ মানুষের মন জয় করা যায়। যারা বিপদে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদের উপর তাদের প্রভাব অবশ্যই পড়বে। ইসলাম নওমুসলমানের মন জয় করার জন্য যাকাতের একটা বিশেষ খাত নির্ধারণ করেছে। আজকে এন. জি. ও.-র প্রভাব অনস্বীকার্য। তাই ইসলামের দাওয়াতী কাজের জন্য এন. জি. ও. সৃষ্টি করে এর মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছতে হবে।

৭. মসজিদ ভিত্তিক কাজ ঃ দেশের মসজিদগুলোকে মদীনার মসজিদে নবওয়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করতে হবে। মসজিদভিত্তিক কাজগুলোকে দু' ভাগে ভাগ করতে হবে। দীনি কাজ ও সামাজিক কাজ। প্রতিটি মসজিদ স্থানীয় লোকদেরকে কুরআন শিক্ষা, তাজবীদ শিক্ষা, তাফসীর শিক্ষা, হাদীস শিক্ষা, ইসলামী আলোচনা, বিভিন্ন উৎসব পালন, আরবী শিক্ষা ও বিভিন্ন সমাজ-কল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে। এর ফলে মহল্লা ভিত্তিক ইসলামী সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া সহজতর হবে।

৮. সরকারী প্রশাসন যন্ত্রে দাওয়াতী কাজ ঃ যারা দেশ চালায় তারা হলো সরকারী আমলা ও কর্মচারী-কর্মকর্তা। তারা সংশোধন হলে দেশে ব্যাপক পরিবর্তন আসতে পারে এবং মানুষের কল্যাণ বাড়তে পারে। যেমন, কোনো অফিসার যদি ঘুষ না খান এবং ইনসাফ কায়েম করেন, তাহলে জনকল্যাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। তাই দায়ী' ইলাল্লাহকে সকল মানুষের সাথে মিশতে হবে ও দাওয়াত দিতে হবে। সরকারের মন্ত্রী পরিষদ, প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টকেও দাওয়াত দিতে হবে।

১৩. যুব সমস্যা ও সমাধান

যুবক-যুবতীদের রয়েছে অনেক সমস্যা। বিভিন্ন সমস্যার কারণে তারা নিজ নিজ দায়িত্ব ঠিকমত পালন করতে পারে না। সমস্যাগুলোর সমাধান হলে তাদেরকে দিয়ে যে কোনো কাজ করানো সম্ভব। বিশেষ করে দীনি দায়িত্ব পালনেও সমস্যাগুলো বাধা সৃষ্টি করে। এটা ঠিক যে, সমস্যামুক্ত কোনো মানুষ বা স্থান দুনিয়ায় নেই। তবুও সমস্যার সমাধান কল্পে যদি যৌবন শক্তিকে কাজে লাগানো যায়, তাহলে বেশী ফল পাওয়া যাবে। আমরা এখন কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ যুব সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করবো।

১. উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, পেরেশানী ও হতাশার কারণে যুবক-যুবতীরা মানসিক চাপের শিকার হয়। মেজাজ রুক্ষ হয়। স্নায়ু উত্তেজিত থাকে,

চেহারায় থাকে মলিনতা। দ্রুততা ও ক্ষিপ্রতার কারণে সাধারণতঃ ঐ চাপ সৃষ্টি হয়। তারা যে কোনো জিনিস দ্রুত পেতে চায়, বিলম্ব মোটেও সহ্য হয় না। তাদের মধ্যে ঝড়ের ক্ষিপ্রতা ও প্রচণ্ডতা থাকে। যে গতিতে ঝড় আসে, সে গতিতে বিদায়ও নেয়। কিন্তু রেখে যায় এক সাগর দুশ্চিন্তা, হতাশা ও উদ্বেগের চাপ। বেগবান আবেগ যখন গতিহীন স্থবির বাস্তবতার সম্মুখীন হয়, তখনই হতাশা ও বঞ্চনার চাপের নীচে ধুঁকে ধুঁকে মরে যুবক-যুবতীরা। প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ষ্টার্নাল হল বলেছেন ঃ Adolescence is the time of storm and stress. 'যুব প্রকৃতি ঝড়-ঝঞ্ঝা ও চাপের সময়।'

কোনো কোনো সময় দুশ্চিন্তার শিকড় এত গভীরে প্রোথিত যে, তা সহজে দূরতো হয়ই না। বরং যুবক-যুবতীর গোটা জীবনকে শেষ করে দেয়। যেমন, একবার মাটিতে বীচি লাগালে তা থেকে চারা গাছ জন্ম নেয়, পাতা গজায়, কাণ্ড এবং শাখা বাড়ে। তারপর তা বিশাল মহীরূহে পরিণত হয় এবং ফল-ফুল দান করে। সমস্যার বীচিও তেমনি মানব জীবনে শাখা বিস্তার করে বিরাট মহীরূহে পরিণত হয় এবং বিষাক্ত ফল দান করে ভোক্তাদের জীবনকে সর্বনাশ করে দেয়। সমস্যার সমাধান করতে না পারলে তারা দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার শিকার হয়। তাদের জীবনে ভাল রেজাল্ট, ভাল চাকুরী, উত্তম বিয়ে, ভাল ব্যবসা ইত্যাকার সোনার হরিণ শিকারের স্বপ্ন থাকে। কিন্তু বাস্তবতার নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে যখন ব্যর্থ হয়, তখনই শুরু হয় এ উদ্বেগ। ক্ষেত্র বিশেষে উদ্বেগ তাদেরকে অস্বাভাবিক আচরণেও বাধ্য করে।

উদ্বেগ থেকে বাঁচার কতগুলো উপায় আছে। আল্লাহর উপর ভরসা বাড়াতে হবে এবং ভাগ্যের লিখনে বিশ্বাস করতে হবে। দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা কমাতে হবে এবং আপনার চেয়ে যারা বড় ও বেশী ধনী তাদের দিকে তাকানো যাবে না। বরং আপনার অপেক্ষা গরীব লোকদের প্রতি তাকিয়ে নিজের কাছে বিদ্যমান সম্পদের শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ مَتَاعٌ ـ الرعد : ٢٦

"আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া সামান্য সম্পদ।"—সূরা আর রা'দ ঃ ২৬

হাসান বসরী (র) বলেছেন ঃ দুনিয়া ও আখেরাত হচ্ছে পূর্ব ও পশ্চিমের ন্যায়। যখনই আপনি একটার দিকে অগ্রসর হবেন, তখনই অন্যটার দূরত্ব বেড়ে যাবে।[১]

---

১. সাপ্তাহিক দাওয়াহ-২৪শে জিলহজ্জ-১৪১৭ হিঃ মোতাবেক-১৯৯৭ সন।

হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ "যদি তারা দুনিয়াবী বিষয়ে তোমার অগ্রগামী হয়, তুমি আখেরাতের বিষয়ে অগ্রগামী হও।"[২]

আল্লাহর উপর ভরসা করলে রিয্‌কের সমস্যা থাকে না। নবী (স) বলেছেন ঃ

لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا ـ

"তোমরা যদি আল্লাহর উপর যথার্থ ভরসা কর, তাহলে তিনি এমনভাবে তোমাদেরকে রিজিক দেবেন যেমনি করে পাখী ভোরে খালি পেটে বেরিয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় পেট ভরে খেয়ে ফিরে আসে।"

ধৈর্য দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির অন্যতম উপায়। আল্লাহ্ বলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যধারণকারীদের সাথে আছেন।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৩

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ اَلصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ "ধৈর্য প্রশস্ততার মাপকাঠি।"

হতাশা ও নৈরাশ্য উদ্বেগের জন্ম দেয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ـ

"আপনি বলে দিন, যারা নিজের আত্মার উপর যুলুম করেছে, তারা যেন আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ না হয়।"–সূরা আয যুমার ঃ ৫৩

হানাফী মাজহাবের দৃষ্টিতে নৈরাশ্য হচ্ছে কুফরী। আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হওয়া হারাম।

নবী করীম (স) আল্লাহর কাছে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ থেকে পানাহ্ চেয়ে দোয়া করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسْلِ ـ

"হে আল্লাহ ! আমরা দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী এবং অক্ষমতা ও অলসতা থেকে পানাহ্ চাই।"

২. সাপ্তাহিক দাওয়াহ-২৪শে জিলহজ্জ-১৪১৭ হিঃ মোতাবেক-১৯৯৭ সন।

দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ সৃষ্টি এবং তাকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে শয়তানের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। কোনো মু'মিনকে নেক আমল থেকে দূরে কিংবা নিষ্ক্রীয় রাখার ব্যাপারে দুশ্চিন্তা অপেক্ষা বড় কোনো হাতিয়ার নেই। তখন দেখা যাবে, নেক বান্দাহ নামাযে মন বসাতে পারে না, জিকর করতে পারে না, খেতে পারে না, ঘুমুতে পারে না, কোনো দীনি দায়িত্ব পালন কিংবা এলেম অর্জন করতে পারে না। শারীরিক, মানসিক ও দীনি দুর্বলতা তাকে গ্রাস করে নিচ্ছে।

ইসলাম সবর, তাওয়াক্কুল ও আল্লাহর কাছে দোয়া এবং বাস্তব জাগতিক কর্মপদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে এর মোকাবিলার জন্য উৎসাহিত করে। ইসলামের এ পদ্ধতি শয়তানের জন্য কাঁটা। তাই সে মু'মিনকে পেরেশানীতে ডুবিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। তাওয়াক্কুল ও সবর সম্পর্কে আমরা উপরে আলোচনা করেছি। একটি দোয়াও উল্লেখ করেছি। এখন আরেকটি দোয়া উল্লেখ করবো।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন কোনো মুসলমান যদি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-পেরেশানীর সম্মুখীন হয় এবং সে যদি নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়ে, তাহলে আল্লাহ তার সে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী দূর করে দেবেন এবং এ দুটোর পরিবর্তে তাকে খুশী দান করবেন। দোয়াটি হল ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ اَمَتِكَ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِىَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِىْ قَضَاءُكَ ، اَسْاَلُكَ اَللّٰهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِىْ كِتَابِكَ ، اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ ، اَوْ اَسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِىْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِىْ وَنُوْرَ صَدْرِىْ وَجَلَاءَ حُزْنِىْ ، وَذَهَابَ هَمِّىْ وَغَمِّىْ -

"হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আমি তোমার দাস, তোমার দাস ও দাসীর সন্তান, আমার কপাল ও ভাগ্য তোমার হাতে, তোমার হুকুম আমার উপর কার্যকর, তোমার ফায়সালা আমার জন্য ইনসাফ। হে আল্লাহ, তোমার কাছে তোমার সকল নাম দ্বারা প্রার্থনা করি, যে সকল নাম তুমি নিজে ধারণ করেছ, অথবা তোমার কিতাবে নাযিল করেছ, কিংবা তোমার কোনো সৃষ্টিকে শিক্ষা দিয়েছ বা তোমার গায়েবী এলমের মধ্যে গোপন রেখেছ, তোমার মহান কুরআনকে আমার অন্তরের ঋতুরাজ বসন্ত,

অন্তরের আলো, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পেরেশানী এবং দুশ্চিন্তা ও কষ্ট দূরকারী বানিয়ে দাও।"–মুসনাদে আহমদ

আল্লাহ দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী দূর করার জন্য হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনা কুরআনে বর্ণনা করেছেন। ইউনুস (আ) মাছের পেটে সাগরের নীচে গভীর অন্ধকারে আল্লাহর কাছে নিম্নোক্ত দোয়া করায় আল্লাহ তাঁর দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী এবং দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ ق اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ٥ - الانبياء : ٨٧

"তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তুমি পবিত্র। নিসন্দেহে আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৮৭

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

فَاسْتَجَبْنَالَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ط وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ -

"আমরা তাঁর দোয়া কবুল করেছি এবং তাঁকে পেরেশানী থেকে মুক্তি দিয়েছি। এভাবে আমরা মু'মিনদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।"

–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৮৮

এ দোয়া করলে আল্লাহ মু'মিনদেরকেও দুশ্চিন্তা মুক্ত করবেন।

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ - النمل : ٦٢

"পেরেশান লোকের দোয়া কে কবুল করে এবং কে তাদের কষ্ট দূর করে?"–সূরা আন নমল ঃ ৬২

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে দোয়ার মাধ্যমে দুশ্চিন্তামুক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

২. অবসর সময়

সময় অত্যন্ত মূল্যবান। আল্লাহ মূল্যবান জিনিসের শপথ করে কথা বলেন। আল্লাহ কুরআন মজীদের একাধিক জায়গায় সময়ের শপথ করে কথা বলেছেন। তিনি وَالْعَصْرِ 'যমানার শপথ।'-(সূরা আসর ঃ ১) وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ 'ফযরের সময় এবং দশ রাতের শপথ।'–(সূরা ফজর ঃ ১) وَالَّيْلِ اِذَا

يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى 'রাতের শপথ, যখন অন্ধকার নেমে আসে এবং দিনের শপথ, যখন আলোকোজ্জ্বল হয়।'-(সূরা লাইল ঃ ১) وَالضُّحَى وَالَّيْلِ اِذَا سَجَى 'প্রাতঃকাল এবং রাত্রির শপথ যখন অন্ধকার নেমে আসে।'-(সূরা দোহা ঃ ১) وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلاَهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلاَّهَا وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا 'শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, শপথ চাঁদের যখন তা সূর্যের পেছনে আসে, শপথ দিনের যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে। শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে।'-সূরা শামস ঃ ১-৪

যুবক-যুবতীদের অবসর সময় বেশী। তারা যদি ছাত্র-ছাত্রী হয়, তাহলে, মা-বাপের উপর সকল দায়-দায়িত্ব থাকে। তারা প্রচুর অবসর সময় পায়। আর যদি বেকার হয়, তাহলেও সময়ের কোনো অভাব নেই। এমনকি চাকুরীজীবি বা পেশাজীবি হলেও তাদের প্রচুর অবসর সময় থাকে। বিশেষ করে ছুটির দিনতো অবসর। অবসর সময়কে কাজে লাগাতে না পারলে তা আরো অনেক সমস্যার জন্ম দেয়। অলস মস্তিস্ক শয়তানের আখড়া। অনেকে কার্টুন ও টেলিভিশন দেখে অবসর সময় কাটায়, আড্ডা দেয়, গল্প-গুজব করে, তাস খেলে, গীবত ও পরচর্চা করে, গান শুনে ইত্যাদি।

নবী (স) দু'টো নেয়ামতের সদ্ব্যবহারের জন্য তাকিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ -

"দু' নেয়ামতের ব্যাপারে বহু মানুষ ধোঁকায় পড়ে আছে। ১. স্বাস্থ্য ও ২. অবসর সময়।"-বুখারী

অবসর সময়ে বহু কাজ করা যায়। আল্লাহর ইবাদাত, জিকির, লেখা-পড়া, দীনি জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষাদান, সমাজ সেবা, দাওয়াতে দীন, পরামর্শ দান, আত্মীয়-স্বজন ও দীনি বন্ধু-বান্ধবের সাথে সাক্ষাত, ইয়াতিম মিসকীনের কল্যাণ, কোনো মানুষের উপকার এবং কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি করা যায়। যে সময় একবার জীবন থেকে খসে যায়, তা আর ফিরে আসবে না। পরে কেবল আফসোস আর আফসোসই বাঁকী থাকবে। কবি বলেন ঃ

"ফুল যদি ঝরে যায় ফুটিবে না আর
সময় চলিয়া গেলে আসিবে না আর ॥"

ইমাম রাজী (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলেছেন, "আমি বরফ গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে এমন একজন বরফ বিক্রেতার বরফ বিক্রীর চিৎকার শুনে সূরা আসরের অর্থ বুঝতে পেরেছি। 'আসর' মানে সময়। মানুষের সময়ও তো বরফের মত ঝরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। পুঁজি কিছু করতে না পারলে শেষ পর্যন্ত খালি হাতে ফিরে যেতে হবে। এটা কতই না বড় ব্যর্থতা !"

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেছেন ঃ "সেই দিন অপেক্ষা আমি আর কোনো দিন এত বেশী লজ্জিত হইনি, যেদিন সূর্যাস্তের সাথে সাথে আমার আয়ু কমেছে, কিন্তু আমার আমল বাড়েনি।"[১]

হাসান বসরী (র) বলেছেন ঃ 'বনী আদমের এমন কোনো দিন অতিক্রান্ত হয়নি, যেদিন তাকে বলা হয়নি ঃ হে আদম সন্তান !

اِنِّي يَوْمٌ جَدِيْدٌ وَعَلَى مَا تَعْمَلُ فِيْهِ شَهِيْدٌ وَاِذَا ذَهَبْتُ عَنْكَ لَمْ اَرْجِعْ اِلَيْكَ ، فَقَدِّمْ مَاشِئْتَ تَجِدْهُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَاَخِّرْ مَا شِئْتَ فَلَنْ يَّعُوْدَ اَبَدًا وَاِلَيْكَ -

"আমি নতুন দিন, তুমি যা করবে সে কাজের সাক্ষী। আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পর আর ফিরে আসবো না। যা ইচ্ছা তা ভবিষ্যতের জন্য কর। তা তুমি পাবে এবং যা ইচ্ছা দেরী কর, তোমার কাছে তা আর ফিরে আসবে না।"[২]

সময়ের অসদ্ব্যবহারকারী নিসন্দেহে অপচয়কারী। কেননা, সে জীবনের একটা অংশ নষ্ট করেছে। হাসান বসরী (র) বলেছেন ঃ "হে আদম সন্তান ! তুমি কতগুলো দিনের সমষ্টি যখনই একদিন অতিবাহিত হয়, তখনই তোমার কিছু অংশ চলে যায়।"[৩]

আল্লামা ইবনুল কাইয়েম জাওজী বলেছেন ঃ "মানুষের উচিত, সময়ের মূল্য ও মর্যাদা বুঝা, এক মিনিটও যেন আল্লাহর নৈকট্য লাভ ছাড়া নষ্ট না হয়।"[৪]

আমাদের জনৈক নেক উত্তরসূরী বলেছেন ঃ "সময় কখনও নিরপেক্ষ থাকে না। হয় সে অন্তরঙ্গ বন্ধু, না হয় মারাত্মক শত্রু হবে।"

---

১. সাপ্তাহিক দাওয়াহ, ১৯শে জুন, ১৯৯৭, রিয়াদ, সৌদী আরব।

২. সাপ্তাহিক দাওয়াহ, ১৯শে জুন, ১৯৯৭, রিয়াদ, সৌদি আরব।

৩. হেলইয়া–আবু নাঈম।

৪. সাইদুল খাতের, ইবনুল কাইয়েম।

আমাদের আলেম সমাজ যদি কোনো একদিনকে কাজে লাগাতে না পারত, লজ্জিত হত, দুঃখিত হতো এবং যা হারিয়ে গেছে তার ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করত। আমাদের কি উপায় হবে ! আমরা তোমাদের পর মাস এবং বছরের পর বছর সময়কে নষ্ট করে যাচ্ছি।

পরিশ্রমের পর বিশ্রাম শরীরের দাবী। সে সময় শরীর ও স্বাস্থ্যের দাবী অনুযায়ী অবসর যাপন অন্যায় নয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

رَوِّحُوا الْقُلُوْبَ سَاعَةً فَسَاعَةً فَاِنَّ الْقُلُوْبَ اِذَا كَلَّتْ عَمِيَتْ۔

"অন্তরকে মাঝে মধ্যে বিশ্রাম দাও। মন ক্লান্ত হয়ে গেলে অন্ধ হয়ে যায়।[১] তাই বিশ্রামের মাধ্যমে মনকে অন্ধত্ব থেকে আলোর কিরণ উপহার দিয়ে সতেজ করতে হবে।

অবসর সময়ের সাথে যদি ধন, ঐশ্বর্য্য ও প্রাচুর্য যোগ হয়, তাহলে, তা বিরাট বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন অবসর সময়কে কাজে লাগানোর নির্দেশ দিয়ে বলেছেন ঃ

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۝ وَاِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ۝ ۔ الم نشرح : ٨-٧

"আপনি যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন এবং আপনার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করুন।"–সূরা ইনশিরাহ ঃ ৭-৮

এ আয়াতে মহানবী (স)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আপনি যখনই দাওয়াত ও ইকামাতে দীনের কাজ থেকে অবসর পান, তখন অন্য কাজের জন্য তৈরি হোন, আর তা হল, আল্লাহর যিকর, দোয়া' ও এস্তেগফারে আত্মনিয়োগ করা। মানুষকে দাওয়াত দেয়া এবং দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হচ্ছে, পরোক্ষ ইবাদাত। আর যিকর, দোয়া' নফল নামায, এস্তেগফার ইত্যাদি হচ্ছে প্রত্যক্ষ ইবাদাত। যদিও দু' ইবাদাতেরই গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু পরোক্ষ ইবাদাতে কষ্ট বেশী। তাই তা করার পর বিশ্রামের বা অবসরের দরকার আছে। কিন্তু সে অবসর ও বিশ্রামের মধ্যে প্রত্যক্ষ ইবাদাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে করে অবসর সময়ের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রত্যক্ষ ইবাদাতকে ক্লান্ত হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত রাখা যায়। অর্থাৎ ক্লান্তি আসতে হবে। শুধু আরাম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়।

---

১. সুনানে দাইলামী।

৩. সাহচর্য

মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের লোককে বন্ধু বা সাথী বলা হয়। নির্ভরযোগ্য বন্ধুকে আরবীতে 'খলীল' বলা হয়। হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে 'খলিলুল্লাহ' আল্লাহর বন্ধু উপাধি দেয়া হয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীর বন্ধু আছে। আমি যদি কাউকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকরকে বন্ধু বানাতাম। হযরত আবু বকরের মর্যাদা আরো বেশী হওয়ায় তিনি তাঁকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করতে পারেননি।

মানুষ ভাল কি না তা তার বন্ধুদের অবস্থা দ্বারা বুঝা যায়। প্রবাদ আছে ঃ A man is known by a Commpany he keeps. 'বন্ধু দ্বারা লোক সম্পর্কে ধারণা করা যায়। বন্ধু ভাল হলে, ব্যক্তিও ভাল, আর বন্ধু খারাপ হলে ব্যক্তিও খারাপ বলে ধরে নিতে হবে। বন্ধু ভাল হলে, অপর বন্ধুকে ভাল কথা ও কাজ এবং উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেবে। আর খারাপ হলে, তাকে খারাপ কাজ ও চরিত্র যেমন, মাদকতা, ধুমপান, মাস্তানী, ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, অপরাধ, মিথ্যা, আড্ডাবাজি, জুয়া ইত্যাদি শিক্ষা দেবে। তাই মানব জীবনে বন্ধু-বান্ধবের ভূমিকা অপরিসীম। বন্ধুদের কাছেই নিজের সকল ভাল-মন্দ ও আবেগ প্রকাশ করে এবং পরিবার ও মাতা-পিতাকে এ পথের অন্তরায় মনে করে। বিশেষ করে যৌন আবেগের ক্ষেত্রেই এটা সর্বাধিক। তাই ভাল বন্ধু হলে, সে তাকে ভুল-ভ্রান্তি এবং পাপ থেকে রক্ষা করতে পারে।

শেখ সাদীর প্রসিদ্ধ কবিতাটি এ ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য ঃ

একদা স্নানের আগারে বসিয়া হেরিয়া মাটির ঢেলা
হাতে নিয়া তারে শুকিয়া দেখিনু রয়েছে তাতে সুবাস মেলা।
কহিনু তাহারে কস্তরী তুমি, তুমি কি আতরদাঁ ?
তোমার গায়ে যে সুবাস ভরা তুমি কি গুলিস্তাঁ ?
কহিল, এসব কিছু নহি, আমি অতি নীচু মাটি
ফুলের সাথে থাকিয়া তাহার সুবাসে হইনু খাঁটি।

সাহচর্যের এ বিরাট গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে মহানবী (স) বলেছেন ঃ

اَلْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ اَحَدَكُمْ مَّنْ يُّخَالِلُ-

"ব্যক্তি বন্ধুর দীনের অনুসারী হয়। তোমাদের উচিত, কার সাথে বন্ধুত্ব করছ, তা দেখা।"-আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজী, হাকেম।

তিনি আরো বলেছেন ঃ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ "ব্যক্তি যাকে ভালবাসে ও বন্ধু বানায়. তার সাথেই তার হাশর হবে।"-তিরমিযী

মহানবী (স) ভাল সাথী গ্রহণ এবং খারাপ সাথী বর্জনের জন্য উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيْسِ السُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ اِمَّا اَن يُّحْذِيَكَ وَاِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ اِمَّا اَنْ يُّحْرِقَ ثِيَابَكَ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةً كَرِيْهَةً -

"ভাল ও মন্দ সাথীর তুলনা চলে আতর-মেশক বিক্রেতা এবং কামারের হাঁপরের সাথে। আতর বিক্রেতা আপনাকে কিছু আতর দিতে পারে, অথবা আপনি তার কাছ থেকে কিছু আতর কিনতে পারেন কিংবা আপনি কমপক্ষে তার দোকান থেকে কিছু সুবাস গ্রহণ করতে পারেন। পক্ষান্তরে কামারের হাঁপর হয় আপনার কাপড় জ্বালাবে, না হয় আপনি এর দুর্গন্ধ লাভ করবেন।"–বুখারী, মুসলিম

হাশরের দিন খারাপ সাথী সম্পর্কে বান্দাহ যে আফসোস ও দুঃখ প্রকাশ করবে সে প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

يَاوَيْلَتِىْ لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيْلاً - لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِىْ

"হায়, আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল।"–সূরা ফুরকান ঃ ২৯

বন্ধু ভাল হলে ভাল প্রভাব আর খারাপ হলে খারাপ প্রভাব বিস্তার করবেই। প্রভাব বিস্তার না করে পারে না। যুবক-যুবতীর বন্ধু-বান্ধবী যেন নেক ও দীনদার এবং আল্লাহর পথের আহ্বানকারী হয়, তা অবশ্যই দেখতে হবে। যুবক-যুবতীদের উচিত, বিষয়টির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা।

আমরা দৈনিক একবার আল্লাহর কাছে খারাপ লোক ও বন্ধু-বান্ধব থেকে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিজ্ঞা করি। আমরা বিতরের নামাযে দোয়া কুনুতে বলে থাকি ঃ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ "আমরা গুনাহগার-অপরাধী–ফাসেক-ফাজেরদেরকে উৎখাত করি ও তাদেরকে বয়কট করি।" ইসলামের দলীয় জীবন যাপনের জন্য ভাল সাথী ও বন্ধুর প্রয়োজন খুব বেশী। আর একথাও সত্য, দুনিয়ায় ভাল লোক ও বন্ধুর অভাব নেই।

৪. বেকারত্ব

আধুনিক সমাজে বেকারত্ব যুবক-যুবতীর জন্য বিরাট সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা। চাকুরী না পাওয়াকে বেকারত্ব বলা হয়। চাকুরী পেলে তো ভাল। না পেলে কি বেকারত্ব দূর করার উপায় নেই ? এজন্য জাতীয় পর্যায়ে বেশ কিছু করণীয় আছে।

বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। তাতে করে চাকুরী না থাকলেও বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করা যায়। সরকারী সমর্থনে এ জাতীয় লোকদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসূচীর বাস্তবায়ন, তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী, দক্ষ জনশক্তি দেশের বাইরে সরবরাহ ইত্যাদি কর্মসূচী হাতে নেয়া যায়।

আমাদের যুব সমাজকে স্মরণ রাখতে হবে, কাজ করা অপমান নয়, বরং সম্মান। তাই লেখা-পড়া শিখে যে কোন কাজের জন্য তৈরি থাকতে হবে। উন্নত দেশগুলোতে তাই হয়ে থাকে। তাছাড়া সাধারণ শিক্ষার দিকে না ঝুঁকে উন্নত প্রযুক্তি ও কারিগরি বিদ্যা শিখা দরকার। যেমন, বিমান ও জাহাজ চালানো, পারমানবিক প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা জরুরী। এতো গেল বস্তুবাদী দিক।

দীনি দিক হচ্ছে, কোন সমাজে বেকারত্ব, অভাব ও দুর্ভিক্ষ কেন দেখা দেয় তা জানতে হবে, এ মর্মে আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا - طه : ١٢٤

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে।"–সূরা ত্বা-হা ঃ ১২৪

মু'মিনরা আল্লাহকে ভুলে গেলে আল্লাহ তাদেরকে রিজকের কষ্ট দেন। পক্ষান্তরে, কেউ যদি আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলে, তাকে তিনি অভাবিত উপায়ে রিজক দান করেন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا لا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ ط -

"আর যে আল্লাহকে ভয় করে তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিজক দেবেন।"–সূরা আত তালাক ঃ ২-৩

বেকারত্ব থেকে মাস্তানী, ছিনতাই, অপহরণ, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বেকারত্ব বিরাট সামাজিক ব্যধি। অভাব-অনটন ও

বেকারত্ব থেকে মুক্তির জন্য আমাদেরকে আল্লাহর কাছে ধর্ণা দিতে হবে। এ বিষয়ে একটি শিক্ষাপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করছি ঃ

ইবনে কাসীর ইবনু আসাকিরের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন। আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) মৃত্যু শয্যায় শায়িত। হযরত ওসমান (রা) তাঁকে দেখতে যান।

ওসমান (রা) বলেন ঃ আপনার কি অসুখ ?

ইবনে মাসউদ (রা) ঃ আমার গুনাহ্সমূহ্ আমার অসুখ।

ওসমান (রা) ঃ আপনার বাসনা কি ?

ইবনে মাসউদ (রা) ঃ আমার রবের রহমতের আশা।

ওসমান (রা) ঃ আমি আপনার জন্য চিকিৎসক ডেকে আনব ?

ইবনে মাসউদ (রা) ঃ চিকিৎসকই তো আমাকে রোগী বানিয়েছেন।

ওসমান (রা) ঃ আমি কি সরকারী বাইতুলমাল থেকে আপনার জন্য উপহার পাঠাবো ?

ইবনে মাসউদ (রা) ঃ আমার দরকার নেই।

ওসমান ঃ উপহার গ্রহণ করুন। আপনার পরে আপনার মেয়েদের উপকারে আসবে।

ইবনে মাসউদ (রা) ঃ আপনি চিন্তা করছেন যে, আমার কন্যারা অভাব ও উপবাসে পতিত হবে। আমি এরূপ চিন্তা করি না। কারণ, আমি কন্যাদেরকে জোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছি, তারা যেন প্রতি রাতে সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করে। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করে সে কখনও উপবাস থাকবে না।

ইবনে কাসীর এর সনদ ও বরাত উল্লেখ করেছেন।

এ ঘটনা প্রমাণ করে প্রতি রাতে সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করলে আল্লাহ্ অভাব-অনটন ও বেকারত্ব দূর করবেন। বেকার যুবক-যুবতীর জন্য এটা বিরাট পাথেয়।

৫. কৌতুক এবং হাসি-ঠাট্টা

হাসি-ঠাট্টা বা কৌতুক করা যুব বয়সের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোন মজলিশে বা কোথাও একত্র হলে তখনই একে অপরের সাথে ঠাট্টা-মস্করা করে। বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে এটা সবচাইতে বেশী।

রাসূলুল্লাহ (স) কৌতুক করতেন এবং সত্য কৌতুক করতেন। আবু হোরায়রা (রা) বলেন ঃ একবার সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে

আল্লাহর রাসূল ! আপনি তো আমাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করে থাকেন। তখন তিনি বলেন ঃ اِنِّىْ لاَ اَقُوْلُ اِلاَّ حَقًّا। "আমি সত্য কৌতুক ছাড়া অন্য কৌতুক করি না।"–(আহমদ ও তিরমিযী)। এর দ্বারা বুঝা যায় সত্য কৌতুক ও হাসি-ঠাট্টা করা জায়েয এবং সুন্নাত।

হাসি-ঠাট্টা মানব মনে খুশী ও আনন্দ সঞ্চার করে। কিন্তু শর্ত হলো, তা যেন মিথ্যা না হয় এবং যুক্তিসঙ্গত সীমা অতিক্রম না করে। তাই কৌতুকের ব্যাপারে তিরমিযী শরীফে ইবনু আব্বাসের রেওয়াতে নিষেধাজ্ঞা আছে।

একদিকে মহানবী (স) থেকে কৌতুকের প্রমাণ, অন্যদিকে এর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বৈপরিত্যের সমাধানে ইমাম নওয়ী বলেছেন ঃ যে কৌতুকে অন্তর কঠিন হওয়ার আশংকা এবং গাম্ভীর্য নষ্ট হবার ভয় আছে সে হাসি-ঠাট্টা নিষিদ্ধ। আর যে হাসি-ঠাট্টা তা থেকে মুক্ত সে কৌতুক মোস্তাহাব।

আবদুল্লাহ বিন হারেস (রা) বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (স) অপেক্ষা অধিক কৌতুককারী অন্য কাউকে দেখিনি।

তাঁর জীবনে কৌতুকের দরকার ছিল। তিনি যদি সর্বদা গুরু-গম্ভীর থাকতেন এবং কৌতুক না করতেন, তাহলে তাঁর সাথে সর্বদা সাহাবায়ে কেরামের, বিশেষ করে প্রায়শ মাস ব্যাপী সফর অভিযানে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ত এবং জ্ঞান আহরণ রুদ্ধ হয়ে যেত। তাই তিনি কখনও মুচকি হাসতেন এবং কখনও কৌতুক করতেন।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস সুফিয়ান বিন ওয়াইনাকে জিজ্ঞেস করা হল, কৌতুক এক বিপদ! তিনি বলেন ঃ না, বরং তা সুন্নত।

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (স) একবার আমাকে 'দুই কান বিশিষ্ট' বলে সম্বোধন করেন।"–আবু দাউদ, তিরমিযী

এর ব্যাখ্যা হলো, হয় তিনি কানে বেশী শুনতেন এবং বহু দূর থেকে শুনতে পেতেন কিংবা তার কান বড় ছিল।

আনাস (রা) বলেন ঃ "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে সওয়ারী চাইলে তিনি তাকে একটি উটের বাচ্চা দেয়ার কথা বলেন। লোকটি বলল ঃ আমি তা দিয়ে কি করবো ? তিনি বলেন ঃ সকল উটই তো কোনো না কোনো উষ্ট্রীর বাচ্চা।" অর্থাৎ তিনি তাকে উটই দিতে চেয়েছেন কিন্তু কৌতুক করে উট না বলে উষ্ট্রীর বাচ্চা বলেছেন।

মহানবী (স) মহিলাদেরকে বোতলের সাথে তুলনা দিয়েছেন। কেননা, বোতল হাত থেকে পড়লেই ভেঙ্গে যায়। তেমনি স্ত্রী লোকও সামান্যতেই মন খারাপ করে ফেলে।

তিনি একবার এক বৃদ্ধা মহিলাকে বলেন ঃ বৃদ্ধারা জান্নাতে যাবে না। অর্থাৎ জান্নাতে তারা যুবতী হয়েই যাবেন।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) যাহের বিন হারাম নামক জনৈক বেদুইনকে খুব ভালবাসতেন। তিনি একদিন পেছন থেকে তার চোখ ধরে ফেলেন। তারপর ছেড়ে দেন। তিনি তাকে দাস সম্বোধন করে বিক্রির প্রস্তাব করেন। সে বলে, আমাকে যে কিনবে সে ঠকবে। তিনি বলেন ঃ "তুমি আল্লাহর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।"–আহমদ

এসব ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়, মহানবী (স) কৌতুকের মাধ্যমেও মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। অর্থাৎ কৌতুক উদ্দেশ্যহীন হতে পারবে না, শিক্ষামূলক হতে হবে।

ওমর ফারুক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর বৈঠকের সাথীদেরকে বলতেন, 'আল্লাহ আপনাদের উপর রহম করুন, একটু কৌতুক ও হাসি-ঠাট্টা করুন।[১]

অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা)-ও যখন শিক্ষা দিতে দিতে অবসাদ বোধ করতেন তখন নিজ সাথীদের প্রতি কৌতুকের আহ্বান জানাতেন।[২]

কোনো কোনো সময় কৌতুক করা মোস্তাহাব। যেমন কারো প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশের জন্য। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একবার নবী করীম (স) আবু তালহার ঘরে প্রবেশ করে তার ছেলে আবু ওমাইরকে বিষন্ন দেখে জিজ্ঞেস করেন, আবু ওমাইর বিষণ্ন কেন ? লোকেরা বললো, তার 'নাগার' বা পাখীর ছানাটি মারা গেছে। সে তার সাথে খেলত। তখন নবী করীম (স) তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের উদ্দেশ্যে কৌতুক করে বলেন ঃ

يَا اَبَا عُمَيْرُ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ -

"হে আবু ওমাইর, পাখী ছানাটির কি হলো ?"–বুখারী, মুসলিম

নবী করীম (স) নিজ স্ত্রীদের সাথেও কৌতুক করতেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে, নবী করীম (স) নিজ স্ত্রী আয়েশার সাথে দুবার

১. সাপ্তাহিক আদ-দাওয়াহ সংখ্যা-১৮৫২, ২৫ জুলাই, ২০০২, রিয়াদ, সৌদী আরব। ২. ঐ

দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। একবার আয়েশা (রা) দৌড়ে অগ্রগামী হন, আরেকবার নবী করীম (স) অগ্রগামী হন। তখন তিনি বলেন, এটা ঐ দিনের বদলা।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, রাসূলুল্লাহ (স) কি কৌতুক বা হাসি-ঠাট্টা করতেন ? তিনি উত্তরে বলেন, 'হ্যাঁ'। তখন লোকটি জিজ্ঞেস করে, তিনি কি ধরনের কৌতুক করতেন ? ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ একবার তিনি তাঁর এক স্ত্রীর গায়ে একটি বড় কাপড় পরিধান করিয়ে বলেন, এটা পরে আল্লাহর প্রশংসা আদায় কর এবং বিয়ের সময় কনের মত এর আঁচল চেচিয়ে হাঁট।–ইবনে আসাকের হাদীসটি দুর্বল।

এ বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি নিজ স্ত্রীকে বিয়ের কনের সাথে উপমা দিয়ে তাঁর মনে আনন্দ ও খুশীর সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন।

৬. কৌতুক ও হাসি-ঠাট্টার মূলনীতি

কৌতুক ও হাসি-ঠাট্টা প্রয়োজন। এর উদাহরণ হলো তরকারিতে লবণের মত। লবণ বেশী বা কম হলে সে তরকারির স্বাদ পাওয়া যায় না। লবণ ঠিকমত হলে তরকারি স্বাদ হয়। ঠাট্টা-মশকরাও তেমনি। তা পরিমিত হতে হবে। বেশী ঠাট্টা-কৌতুক যেমন ঠিক নয়, তেমনি ঠাট্টা-কৌতুক বিহীন অবস্থাও আকাঙ্ক্ষিত নয়। নিম্নের মূলনীতিগুলোকে সামনে রাখলে হাসি-ঠাট্টায় আর কোনো সমস্যা থাকে না।

১. হাসি-ঠাট্টা ও কৌতুক সত্য হতে হবে। যেমন, তিরমিযী ও আহমাদে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, নবী করীম (স) বলেন, আমি সত্য কৌতুক ছাড়া অন্য কৌতুক করি না।

২. মোবাহ ও জায়েয কৌতুকে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। বেশী হাসি-ঠাট্টা, কৌতুকে বেশী হাসির উদ্রেক করে—আর অধিক হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে। তখন অন্তর আল্লাহ থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা অধিক হেসো না। অধিক হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে।'–তিরমিযী, ইবনে মাজা

৩. ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী কষ্টদায়ক ঠাট্টা-কৌতুক ত্যাগ করতে হবে। এর ফলে রাগ-ক্রোধ জন্ম নেয়। কোনো কোনো সময় এর ফলে এক সম্প্রদায়ের সাথে অন্য সম্প্রদায় কিংবা এক জাতির সাথে আরেক জাতির যুদ্ধ ও সংঘাত

সৃষ্টি হয়। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ তোমার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া ও ঠাট্টা করো না।–(তিরমিযী, হাদীসটি হাসান ও গরীব)। তিনি এ হাদীসে শত্রুতা ও ঠাট্টাকে এক সাথে বর্ণনা করেছেন। কেননা ক্ষতিকর ঠাট্টার পরিণতি মারাত্মক হতে পারে।

৪. মনের অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করে তেজীভাব সৃষ্টি করার লক্ষে কৌতুক জায়েয। নবী (স) বলেছেন, 'তোমরা মনকে প্রফুল্ল করার জন্য কখনো কখনো বিনোদন কর।'–(সুনানে দাইলামী)। কৌতুক ও হাসি-ঠাট্টা বিনোদনের একটি মাধ্যম।

৫. মনের দুর্বলতা ও পেরেশানী দূর করার জন্য কৌতুকের ব্যবহার উত্তম। নবী করীম (স)-এর বর্ণিত কৌতুকগুলোর অধিকাংশই বৃদ্ধ, অসুস্থ, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, শিশু ও নারীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে।

৬. মানুষের ইজ্জত-সম্মান নিয়ে কোনো কৌতুক করা যাবে না। যদি কোনো ব্যক্তির প্রতি বিদ্রূপ, অবজ্ঞা ও খারাপ উদ্দেশ্যে হাসি-ঠাট্টা করা হয় তাহলে সেটা হবে হারাম। সূরা হুজুরাতের ১১ আয়াতে আল্লাহ তা নিষেধ করেছেন।

৭. ভয়-ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কৌতুক ও হাসি-ঠাট্টা জায়েয নেই। একবার নবী করীম (স)-এর সাথে সাহাবায়ে কেরাম সফরে বের হন। একজন সাহাবী পথে ঘুমিয়ে পড়েন। অন্য একজন সাহাবী ঘুমন্ত সাহাবীর তীর হাতে তুলে নেন। তখন ঐ সাহাবী হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ভীত হয়ে পড়েন। তখন নবী করীম (স) বলেন ঃ

لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يُفْزِعَ مُسْلِمًا وَلَوْ هَازِلاً -

"কোনো মুসলমান অন্য কোনো মুসলমানকে ঠাট্টা করে হলেও ভয় দেখানো জায়েয নেই।"–আহমদ, আবু দাউদ

৮. কেবলমাত্র হাসানোর উদ্দেশ্যে লক্ষ্যহীন কৌতুক বলা নাজায়েয। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও কি আছে যে লোকদেরকে হাসানোর জন্য কথা বলে যার ফলে সে আসমান থেকেও আরো দূরবর্তী স্থানে পতিত হয় ? তোমাদের মধ্যে কি এমন ব্যক্তিও আছে যে কেবলমাত্র নিজ সাথীদেরকে হাসায়, ফলে আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে দোযখে প্রবেশ করানোর আগ পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হন না।"–আবুশ শেখ-সনদ হাসান

৯. ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী কোনো কৌতুক ও ঠাট্টা করা হারাম। সেটা কোনো কমেডি ও ট্রাজেডী যাই হোক না কেন, আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ -

"তাদের বলো, তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর আয়াত ও রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছো ?"–সূরা আত তাওবা ঃ ৬৫

১০. অমুসলিমদের অনুকরণে কৌতুক নিষিদ্ধ। যেমন, এপ্রিল ফুল। এটা স্পেনের মুসলিম হত্যার দুঃখজনক ঘটনার স্মৃতি। খৃস্টান জগত সে হত্যাকাণ্ডকে আনন্দ প্রকাশের জন্য কৌতুকের মাধ্যমে তাদের মধ্যে স্মরণীয় করে রেখেছে। মুসলমানরা কি করে আপন ভাইদের সে দুঃখজনক স্মৃতির ব্যাপারে খৃস্টানদের সাথে একাকার হতে পারে ? ঈমান থাকলে তা কখনোও সম্ভব নয়।

১১. দাম্পত্য জীবনের গোপন বিষয় অন্যদের সামনে ঠাট্টা আকারে পরিবেশন করা হারাম। নবী করীম (স) বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন সে ব্যক্তির মর্যাদা হবে সর্বাধিক নিকৃষ্ট যে নিজ স্ত্রীর সাথে মিলনের পর তা তার বন্ধুর কাছে প্রকাশ করে।'–মুসলিম

১২. তিন বিষয়ে ঠাট্টা নিষিদ্ধ। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তিনটি বিষয় এমন যে ঠিকমত বললেও হয়ে যাবে এবং ঠাট্টা করে বললেও হয়ে যাবে। ১. বিয়ে, ২. তালাক, ৩. তালাকের পরে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা।–তিরমিযী

কৌতুক ও ঠাট্টার বিষয়ে ইসলামী নীতিমালা অবশ্যই সামনে রাখতে হবে।

৭. খেলাধূলা ও বিনোদন

যুব বয়সে খেলাধূলা অন্যতম প্রয়োজন। বেশীর ভাগ কিশোর যুবকই খেলাধূলায় অংশ নেয়। খেলাধূলার মাধ্যমে ব্যায়াম হয়। মনে আনন্দ আসে এবং সময়ের সদ্ব্যবহার হয়। ব্যায়াম না করলে শরীর রোগা হয় এবং দ্রুত অসুখে ধরে। তাই মহানবী (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّاِنَّ لِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا -

"নিশ্চয়ই তোমার উপর তোমার শরীর, স্ত্রী ও পরিবারের অধিকার আছে। এখানে শরীরের অধিকার বলতে বিশ্রাম, ব্যায়াম ও শরীরকে রোগমুক্ত রাখার চেষ্টার কথা বলা হয়েছে।"

খেলাধূলার অন্যতম শর্ত হল, তা ইসলামের কোন হুকুমের লংঘন হতে পারবে না। যেমন, হাফ প্যান্ট পরে খেলাধূলা করলে সতর প্রকাশিত হয়। তা দেখা ও দেখানো নাজায়েয। যদি পাজামা ও প্যান্ট ইত্যাদি পরে সতর ঢেকে খেলে তা জায়েয।

কুরআনে হযরত ইউসুফ (আ)-কে খেলার সাথী হিসেবে পাওয়ার জন্য ভাইয়েরা পিতার কাছে আবদার করেছিল বলে উল্লেখ এসেছে। আল্লাহ্ বলেনঃ

اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ - يوسف : ١٢

"হে পিতা ! আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে পাঠান, তৃপ্তি সহকারে খাবে ও খেলাধূলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো।'
–সূরা ইউসুফ ঃ ১২

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, প্রমোদ-ভ্রমণ ও খেলাধূলা বিধিবদ্ধ সীমার ভেতরে নিষিদ্ধ নয় বরং সহীহ হাদীস থেকেও এর বৈধতা প্রমাণিত।

ইসলাম মানব প্রকৃতি সম্মত জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের শরীর ও মনের খোরাক কি তাও জানেন। সঠিক নিয়তের ভিত্তিতে খেলাধূলাও ইবাদাতে পরিণত হতে পারে। ইসলাম মানব প্রকৃতিতে বিদ্যমান আনন্দ, খুশী ও হাসি-ঠাট্টাকে অস্বীকার করে না। স্বয়ং মহানবী (স)-ও মানব মনের প্রেরণা ও চাহিদা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি বলেছেন ঃ

لِكُلِّ عَمَلٍ شَرَّةٌ وَّلِكُلِّ شَرَّةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهٗ اِلٰى سُنَّتِىْ فَقَدِ اهْتَدٰى -

"প্রত্যেক আমলের জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাতে হয়। আর প্রত্যেক চূড়ান্ত প্রচেষ্টার পর দরকার হয় বিশ্রামের। যার বিশ্রাম আমার পদ্ধতি ও সুন্নত অনুসারে হয়, সে হেদায়েত লাভ করে।"

এ হাদীসে সুন্নত পদ্ধতির বিনোদনের কথা বলা হয়েছে।

কিছু কিছু শিক্ষাবিদদের মতে, ভাল খেলাধূলাকে মন্দ খেলাধূলা থেকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে হবে। তারা বলেন ঃ বিশুদ্ধ বিশ্রাম বিশুদ্ধ কাজের গুরুত্বের চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

খেলাধূলা তিন প্রকার। এক ধরনের খেলাধূলা শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর জিকর ও ইবাদাত থেকে বিরত রাখে। আরেক ধরনের

খেলাধূলা দ্বারা দীনের হেফাজত, ইজ্জত-সম্মান ও শক্তি বাড়ে। অন্য আরেক ধরনের খেলাধূলা হচ্ছে জায়েয বা মোবাহ্ যাকে শরীয়ত নিষিদ্ধ করেনি। আবার এর দ্বারা শরীয়তের তেমন কোন ফায়দাও নেই। যেমন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উন্মুক্ত আকাশের এবং সাগরের পানির দিকে তাকিয়ে উপভোগ করা কিংবা ভ্রমণ করা ও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মজা উপভোগ করা।

হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ "শরীরের মত মনও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মনের জন্য হেকমতপূর্ণ বিজ্ঞ কৌতুক তালাশ কর।"

প্রবাদ আছে, "তরকারির মধ্যে যে পরিমাণ লবণ দেয়া হয়, আলাপের মধ্যেও সে পরিমাণ কৌতুক প্রবেশ করাও।"

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেন ঃ "মনের রয়েছে খাহেশ ও অগ্রসরতা। আবার এর রয়েছে পশ্চাদপদতাও। খাহেশ ও অগ্রসরতার সময় তাকে ধর এবং পশ্চাদপদতার সময় ছাড়।"[১]

হযরত ওমার বিন আবদুল আযীয (র) বলেছেন ঃ "তোমরা আল্লাহর কিতাব থেকে আলোচনা কর এবং কুরআনের মজলিশ বসাও। ক্লান্ত হয়ে পড়লে মানুষের সুন্দর কাহিনী আলোচনা কর।"[২]

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আসমানী সহীফায় বর্ণিত আছে ঃ "জ্ঞানীর সময় তিন প্রকার হওয়া উচিত। এক সময়, আল্লাহর কাছে মুনাজাত করবে।

আরেক সময় আত্মসমালোচনা করবে এবং অন্য আরেক সময়, নফসকে হালাল এবং সুন্দর বিষয় উপভোগের জন্য ছেড়ে দেবে। এ সময়টি তার অন্যান্য সকল সময়ের সহযোগী।"[৩]

ব্যায়াম ও খেলাধূলার মাধ্যমে মু'মিন শক্তিশালী হয়। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَّاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ -

"আল্লাহর কাছে শক্তিশালী মু'মিন দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা উত্তম ও অধিকতর প্রিয়।"–মুসলিম

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

---

১. দৈনিক আল মদীনা, জেদ্দা-১৭ই আগস্ট, ১৯৯৫।
২. ঐ, ৩. ঐ

كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ فَهُوَ لَهْوٌ اَوْ سَهْوٌ اِلاَّ اَرْبَعُ خِصَالٍ مَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرْضَيْنِ وَتَأْدِيْبُهُ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتُهُ اَهْلَهُ وَتَعْلِيْمُهُ السِّبَاحَةَ -

"আল্লাহর স্মরণ বিহীন সকল কাজ বেহুদা খেল-তামাশা কিংবা ভুল। শুধুমাত্র ৪টি জিনিস এর ব্যতিক্রম। ১. দুই লক্ষ্যবস্তুকে নির্ধারিত করে এর মধ্যে হাঁটা, ২. ঘোড় দৌড় শিক্ষা দেয়া, ৩. স্ত্রীর সাথে আনন্দ-স্ফূর্তি করা এবং ৪. সাঁতার শিক্ষা দেয়া।"–তাবরানী ভাল সনদ

হযরত ওমর ফারুক (রা) সকল গভর্নরের প্রতি চিঠিতে আদেশ দিয়েছেন ঃ

فَعَلِّمُوا اَوْلاَدَكُمُ الرِّمَايَةَ وَالسِّبَاحَةَ وَرُكُوْبَ الْخَيْلِ -

"তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে তীর নিক্ষেপ, সাঁতার ও ঘোড়ায় আরোহণ শিক্ষা দাও।"

বর্তমান যুগে জুডো, কারাতি এবং অন্যান্য সামরিক কুচকাওয়াজ শিক্ষা গ্রহণ করাও এর অন্তর্ভুক্ত। যদি তা ইসলামের সীমার ভেতর থাকে। এর লক্ষ্য হল সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া।

জায়েয খেলাধূলাকে প্রচার মাধ্যম তথা রেডিও-টেলিভিশনে অন্যদের দেখার উদ্দেশ্যে প্রচার করা যেতে পারে। হাদীসে এসেছে, একদিন হযরত আয়েশা মসজিদে নববীতে হাবশীদের সামরিক প্রশিক্ষণমূলক খেলা উপভোগ করেন। তিনি নবী (স)-এর কাঁধের উপর নিজ থুঁতনী রেখে আড়াল থেকে ঐ খেলা উপভোগ করেন। যে পর্যন্ত না আয়েশার তৃপ্তি হয় সে পর্যন্ত তিনি খেলা দেখেন। এ ঘটনা বুখারী এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

খেলাধূলায় হার-জিতের প্রতেযোগিতা জায়েয। তবে সে জন্য ৩য় পক্ষ থেকে পুরস্কারও জায়েয আছে। পুরস্কার প্রতিযোগিতায় টাকার শর্ত আরোপ করা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। এটা হারাম। আল্লাহ কুরআনে ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের দৌড় প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ -

১. দৈনিক আল মদীনা জেদ্দা-১৭ই আগষ্ট, ১৯৯৫।

"হে পিতা ! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলাম এবং ইউসুফকে আমাদের আসবাবপত্রের কাছে রেখেছিলাম। ইতিমধ্যে বাঘ এসে ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছে।"–সূরা ইউসুফ ঃ ১৭

ইবনুল আরবী আহকামুল কুরআনে বলেন ঃ "পারস্পরিক দৌড় প্রতিযোগিতা শরীয়ত সিদ্ধ এবং একটি উত্তম খেলা। এটা জিহাদের জন্যও সহায়ক। স্বয়ং মহানবী (স)-ও হযরত আয়েশার সাথে দু' দু'বার দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন।"

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সালমা বিন আকওয়া জনৈক ব্যক্তির সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন। এ সকল বর্ণনা দ্বারা প্রতিযোগিতা বৈধ বলে প্রমাণিত। গান-বাজনা শুনা হারাম। ইসলামী গান জায়েয আছে। মহানবী (স) বলেছেন ঃ

مَنْ قَعَدَ اِلَى قِيْنَةٍ يَسْمَعُ صُبَّ فِىْ اُذُنَيْهِ الْاَنَكُ ـ

"কেউ যদি কোন গায়িকার গান শোনার জন্য বসে, তার দুই কানে গলিত শীশা ঢেলে দেয়া হবে।"

হযরত আবু বকর (রা) বলেছেন ঃ গান ও বাদ্যযন্ত্র শয়তানের হাতিয়ার।[১]

টেলিভিশনের পর্দায় পর্দাহীন নারী দেখা আর বাইরে পর্দাহীন নারী দেখা সমান গুনাহ। আল্লাহ কোন নারীর দিকে নজর করলে চোখে শীশা ঢেলে দেবেন বলে হাদীসে উল্লেখ আছে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ اُمَّتِىْ قَوْمُ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحَرَّ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ ـ

"আমার উম্মাতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি হবে, যারা যেনা-ব্যভিচার, রেশম, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।"–বুখারী

বর্তমান যুগে গান-বাজনার ক্ষেত্রে মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে। মুসলমানরা অনৈসলামী গান ও বাদ্যযন্ত্রের দেদার ব্যবহার করছে এবং এটাকে নাজায়েয মনে করছে না। বরং সম্পূর্ণ খোলা মনে তথাকথিত সংস্কৃতির পসন্দ মন দিয়ে তা উপভোগ করছে।

আল্লাহ বলেন ঃ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ "আল্লাহর ধরা বড় শক্ত"–(সূরা বুরুজ)। তিনি যখন ধরবেন তখন মজা ঠিকমত টের পাওয়া যাবে।

---

১. তাওজীহাত ইলা আসহাবিল ফিদিও ওয়াত তাসজীলাত–শেখ আবদুল্লাহ বিন জারুল্লাহ, সৌদী আরব।

১৪. যৌন সমস্যার সমাধান

যৌন চাহিদা ঃ বিয়ে ও প্রেম ঃ আশ্চর্য কাহিনী

বিয়ে ঃ যৌবন মানে যৌন শক্তি, যুবক-যুবতীরা এ যৌন শক্তির বাহক, যৌন শক্তি আল্লাহর বিরাট নেয়ামত। এর মাধ্যমেই আল্লাহ মানুষ সহ সকল প্রাণী জগতের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছেন। তারাই বংশ বিস্তার করে এবং জনগোষ্ঠীর পর জনগোষ্ঠী দুনিয়ায় আসে ও বিদায় নেয়। এর মাধ্যমেই পরিবার, গঠিত হয় এবং আত্মীয়-স্বজন সৃষ্টি হয়। সমাজের বিকাশও এখান থেকেই হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ যৌন শক্তির সদ্ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের আদেশ দিয়েছেন। তিনি মানবজাতির মধ্যে বিয়ের প্রথা চালু করেন। হযরত আদম (আ)-এর সাথে হাওয়ার বিয়ের মাধ্যমে প্রথম দিন থেকেই যৌন আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে দেন। তাই পৃথিবীর সকল আসমানী কিতাবে বিয়ের কথা ও তার অনুসরণের উল্লেখ আছে। আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ج - النساء : ١

"হে মানুষ ! তোমরা তোমাদের সেই মহান রবকে ভয় করে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চল, যিনি একটি মাত্র আত্মা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর তার থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার জুড়ি। আর এ দু'জন থেকেই ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য নারী ও পুরুষ।"–সূরা আন নিসা ঃ ১

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ -

"বিয়ে আমার সুন্নত বা পদ্ধতি। যে আমার সুন্নত বা পদ্ধতি থেকে বিরত থাকে সে আমার উম্মত নয়।"–বিশুদ্ধ হাদীস

ইসলাম যুবক-যুবতীর যৌন চাহিদা পূরণের জন্য বিয়েকে একমাত্র বৈধ পদ্ধতি হিসেবে ঘোষণা করেছে। বিয়ের কোনো বিকল্প বা চোরাপথ নেই। তাই যুবক-যুবতীরা পরিণত বয়সে পৌঁছলে, এবং শারীরিক ও আর্থিক সঙ্গতি থাকলে তাদেরকে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। যদি কোনো যুবক-যুবতীর উপরোক্ত শর্ত পূরণের ক্ষমতা না থাকে, তাদের যৌন চাহিদা নিয়ন্ত্রণের ২য় উপায় হল, রোযা রাখা। রোযা তাদের জন্য ঢাল স্বরূপ। এর দ্বারা শরীরের

কামনা-বাসনা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং যৌন আবেগ চাপা পড়ে। এ মর্মে মহানবী (স) বলেছেন ঃ

يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرَجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ -

"হে যুব সমাজ ! তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ আছে সে যেন বিয়ে করে। কেননা, তা চোখ অবনত রাখা সহ লজ্জাস্থানের উত্তম হেফাজতকারী। আর যার বিয়ের সামর্থ নেই সে যেন রোযা রাখে। রোযা হচ্ছে তার জন্য ঢাল স্বরূপ।"–বুখারী, মুসলিম

রোযা রাখার উদ্দেশ্য খাওয়া কমানো। বেশী খেলে যৌন চাহিদা বাড়ে। তাই ইসলামে নফল রোযার বিধান রাখা হয়েছে। যেমন, প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার, প্রত্যেক মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে শাওয়ালের ৬ রোজা, আশুরার রোযা, আরাফাহ দিবসের রোযা এবং একদিন পরপর হযরত দাউদ (আ)-এর রোযা ইত্যাদি।

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে সামর্থবান যুবক-যুবতীর জন্য বিয়েকে ফরয করা হয়েছে। এ ফরয লংঘন করলে তাদের গুনাহ হবে। ইসলাম সামর্থবান ও সামর্থহীন যুবক-যুবতীর জন্য যৌন চাহিদা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে দু'টো নির্দেশ জারী করে সমাজকে নিষ্কলুষ রেখেছে।

পাশ্চাত্যে এবং অন্যান্য অমুসলিম দেশে মানুষ পশুর মত যৌন তাড়নার পেছনে ধাবিত হচ্ছে। তাদের নীতি-নৈতিকতা কিংবা অবৈধতার কোনো বিবেচনা নেই। সে কারণে আজ সেখানে পরিবার প্রথা ভেঙ্গে যাচ্ছে, কুমারী মা ও জারজ সন্তানের আধিক্যে সমাজে হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে। ঘাতক এইডস রোগ যৌন উন্মাদনার অন্যতম ফসল এবং উপযুক্ত শাস্তি। যৌন কেলেংকারী ও সহিংসতা সে সমাজের মারাত্মক কুৎসিত চেহারা।

প্রেম ঃ অনেক যুবক-যুবতী প্রেম-ভালবাসায় জড়িয়ে পড়ে। তাদেরকে নষ্ট করার জন্য প্রেম শয়তানের এক মারাত্মক হাতিয়ার। প্রেম হচ্ছে, অবৈধ যৌন সম্পর্ক। যা ধ্বংসাত্মক ও মারাত্মক। একে কেঁদা ফলের সাথে তুলনা করা যায়। বাহ্যিক চেহারা খুবই সুন্দর, কিন্তু আভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত তিক্ত। এটাকে বিষ বাষ্প বললেও ভুল হয় না। তারা যে আগুন নিয়ে খেলছে, তা বুঝতে পারে না।

প্রেম হচ্ছে যৌন চাহিদা পূরণের পাশবিক আচরণ। তা শেষ পর্যন্ত জীবনকেও নিঃশেষ করে দেয়। অবশ্য এর আগেই অর্থ, সময়, যোগ্যতা ও

ক্যারিয়ারের বলি সমাপ্ত হয়ে যায়। কোনো প্রেমিক-প্রেমিকা জীবনে ভাল কোনো ক্যারিয়ার গঠন করতে সক্ষম নয়। ক্যারিয়ার গঠনের জন্য চাই ধ্যান-সাধনা ও একাগ্রতা। কিন্তু তা তো কেড়ে নিয়েছে প্রেমিক বা প্রেমিকা। ফলে, যুবক-যুবতীর সম্ভাবনাময় সুন্দর ফুলের কলিগুলো অকালেই ঝরে যায়। ফুল আর ফোটে না।

নারী-পুরুষের বিপরীতমুখী আকর্ষণকে বিয়ের আগে জাগরিত করা আনবিক বোমার বিস্ফোরণের সমতুল্য। বোমার আগুন হয়তো নিভে যায়, কিন্তু প্রেমের আগুন তুষের আগুনের মত অব্যাহতভাবে জ্বলতেই থাকে। জীবনের সকল চাওয়া-পাওয়াকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। এজন্য তাকে দুঃখের সাগরে ডুব দিতে হয় এবং প্রেমের বেড়ীতে আটক পা অন্য কোনো কাজের দিকে অগ্রসর হতে পারে না।

প্রেম হচ্ছে পাপ। মানুষ সহজেই প্রেমের সাগরে প্রবেশ করে। সেখান থেকে সহজে বেরিয়ে আসতে পারে না। প্রখ্যাত রোমান কবি হোরাস বলেছেনঃ 'পাপ ও মন্দ থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে তুমি তুলনামূলকভাবে দুর্বল। কেননা, তুমি পাপের পিচ্ছিল ভূমিতে অবস্থান করছ। এক পা সরিয়ে আনলেও অন্য পা তাতে পড়ে যাবে।[১] দেখা যায়, একবার প্রেমের জালে আটকা পড়লে আর বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় না। বেরিয়ে আসার চাইতে মৃত্যু কামনাকে শ্রেয় মনে করে।

ভালবাসা যুবক-যুবতীকে ভিন্ন জগতে নিয়ে ছাড়ে। তারা কল্পনার রাজ্যে ভেসে বেড়ায়। প্রিয়তমের পসন্দ-অপসন্দই তার জীবনে সকল কিছুর মাপকাঠি। তার পসন্দনীয় জিনিস ছাড়া যেন আর কোনো কাজই কাজ নয়। সময়কে প্রেমিকের অনুপস্থিতিতে সংক্ষিপ্ত মনে হয় এবং তার সাথে আলোচনাকে মধুময় মনে করা হয়। আর এ কারণেই নিজের ভবিষ্যত ও অন্যের কল্যাণ কোনোটাই সম্ভব নয়।

প্রেমিকের স্মরণ আল্লাহর জিকরকেও হার মানায়। যিনি সৃষ্টি করলেন তার কথা কচিৎ মনে পড়ে। আর সৃষ্ট জিনিসকে প্রতিমূহুর্তে স্মরণ হয়। তাকে দেখলে তরে, না দেখলে মরে। দেখতে হবে, কে তার স্বাধীনতা ও ইচ্ছাশক্তি কেড়ে নিয়েছে? কোন্ অধিকারে? সে কি বড় জ্ঞানী-গুণী, বুদ্ধিমান, মর্যাদাবান ও শক্তিশালী? না, তাতো নয়। সে একজন ক্ষুদ্র প্রেমিকা। হয়তো দৈহিক রূপ-সৌন্দর্য ছাড়া তার আর কোনো গুণ বৈশিষ্ট্য নেই। তা সত্ত্বেও সে তার সৌন্দর্যের ধারাল অস্ত্র দিয়ে যুবককে কাবু করে ফেলেছে। সে হাতিয়ারটা কি?

১. আল ইনসান-আদওয়ার ওয়া আকদার–ফয়সল বিন মোহাম্মদ ইরাকী। সাফা প্রকাশনী, মক্কা-১৪১১ হিঃ।

হতে পারে তা যুবতীর নমনীয়তা ও কমনীয়তা। এ সামান্য অস্ত্র দিয়েই সামান্য যুবতী শক্তিধর যুবককে যুদ্ধে পরাজিত করতে চায়।

আল্লাহ প্রেমিকার মুখে যে সৌন্দর্য দান করেছেন এটাকে আল্লাহর কুদরত এবং সম্পদ মনে করে হেফাজত করা দরকার। ফরাসী নীতিবাদী দার্শনিক লাপারপার বলেছেন ঃ 'সুন্দর মুখ উত্তম দৃশ্য। প্রেমিকের কানে প্রেমিকার শব্দ উত্তম বাজনা।'[১] এ রকম হলে, আল্লাহ তাকে মজবুতভাবে পাকড়াও করবেন, কেন তাঁর নেয়ামতের অসদ্ব্যবহার করা হয়েছে।

অন্তরে ভালবাসার তীর বিদ্ধ হলে বাস্তব সত্য হারিয়ে যায়। জ্ঞান ও বোধশক্তি লোপ পায়। প্রেমিকার সামনে প্রেমিক যেন কারাবন্দী এদিক-সেদিক নড়াচড়ার শক্তি নেই। ফলে শুভ বুদ্ধির উদ্রেক হওয়া সুদূর পরাহত।

প্রেম ক্ষণস্থায়ী মনের আনন্দ। এটা হচ্ছে মাতলামী ও নেশাগ্রস্ততা। হয়তো এক পর্যায়ে, এ মাতলামী থেকে জেগে উঠে ও বোধোদয় ঘটে। কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছে। তখন হয়তো মাটির জান্নাত জাহান্নামে পরিণত হয়েছে। অভিমানের বিষাক্ত সাপের দংশনে সে এখন ধরাশায়ী।

যখন প্রেমিকার বিশ্বাসঘাতকতা ও ছলনা পরিষ্কার হয়, ব্যর্থ প্রেমের শুকনো গোলাপ যখন অর্থহীন হয়ে পড়ে, তখন শয়তান এসে জিঘাংসা ও হিংসার আগুন জালিয়ে যায়। ধ্বংসের পর ধ্বংসের শিকল পরায়। প্রেমিক বুঝতে পারে যে, প্রেমের বিপদ সংকুল দ্বীপে যদিও ক্ষণিকের প্রশান্তি অর্জিত হয়েছিলো। কিন্তু তাতে ছিল চরম অন্ধকার ও মারাত্মক বিভীষিকা। তখন সে প্রতিশোধ মুখর হয়ে উঠে। যে কোনো মূল্যে বিশ্বাসঘাতক প্রেমিকার ক্ষতির অব্যাহত চেষ্টা চালাতে থাকে। এখান থেকেই শুরু হয় মুখে এসিড নিক্ষেপ, অপহরণ, ধর্ষণ, বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার ও বিয়ে না হওয়ার প্রচেষ্টা। উল্টোও দেখা যায়। ব্যর্থ প্রেমের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে বসে। হাদীসে এসেছে, আত্মহত্যাকারী জাহান্নামী। দুনিয়া এবং আখেরাত সবকিছুই সাবাড়।

ইসলাম প্রেমকে এজন্য নিষেধ করেছে, প্রেম যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এটা আবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রেমের জন্য যুবক-যুবতীর পারস্পরিক সাক্ষাত ও কথাবার্তা জরুরী। এজন্য পর্দা লংঘন হয়। পর্দা লংঘন হারাম। হাদীসে এসেছে, কোনো পুরুষ কোনো নারীর দিকে তাকালে আল্লাহ তার চোখে সীসা ঢেলে দিবেন।

---

১. আল ইনসান-আদওয়ার ওয়া আকদার–ফয়সল বিন মোহাম্মদ ইরাকী। সাফা প্রকাশনী, মক্কা-১৪১১ হিঃ।

পর্দা লংঘনের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে মহানবী (স) বলেছেন ঃ "আমি দু' ধরনের জাহান্নামী লোককে দেখিনি। এক সম্প্রদায়ের হাতে গরুর লেজের মত লম্বা বেত যা দিয়ে তারা লোকদেরকে মারে। কাপড় পরা স্ত্রীলোক অথচ উলঙ্গ, হেলে-দুলে চলতে অভ্যস্ত এবং অন্যদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্টকারিণী, তাদের উন্মুক্ত মাথায় উটের কুজের মত উঁচু খোঁপা বেঁধে ঠাক ঠমকে চলে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং এর ঘ্রাণ পর্যন্ত পাবে না। অথচ এত ...... দূর থেকেও এর ঘ্রাণ পাওয়া যায়।"-(মুসলিম) এ হাদীসে বর্ণিত জাহান্নামী নারীর সকল গুণাবলী প্রেমিকার মধ্যে পাওয়া যায়। প্রেমিককে আকৃষ্ট করার জন্য সে সর্বদা সেজেগুজে, হেলে-দুলে চলে, পাতলা কাপড় কিংবা আঁট-সাট পোশাক পরে এবং মাথার চুলকে রঙবেরঙে সাজায়।

হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا ـ

"কোনো নারী যেন কোনো পুরুষের সাথে একাকীত্বে অবস্থান না করে। কেননা, তাদের মধ্যে তখন তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে শয়তান।"–আহমদ

প্রেম বাস্তবতা বিবর্জিত। বিয়ের জন্য আদর্শ গৃহিণীর যে গুণাবলী থাকা দরকার, প্রেমের মধ্যে তা অনুপস্থিত। ফলে প্রেমের বিয়ে বেশীদিন টিকে না। তাছাড়া, এতে অভিভাবকের পসন্দ-অপসন্দের কোনো স্থান নেই। অথচ, অভিভাবকরাই সন্তানের বড় হিতাকাঙ্ক্ষী। তারা যুবক-যুবতীর সুখ-শান্তিকে সামনে রেখে নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের কল্যাণে সিদ্ধান্ত দেবেন। এটাই হবে সুখের কারণ।

মিসরের এক জনমত জরীপে জানা যায়, শতকরা ৭৫ ভাগ প্রেমের বিয়ে ভেঙ্গে গেছে এবং তালাকের মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।[১]

প্রেমের উপরোক্ত ক্ষতিগুলো ছাড়াও আরো কিছু ক্ষতি আছে। প্রেম মানুষকে শিরক এবং কুফরী পর্যন্ত পৌঁছায়। আল্লামা ইবনুল কাইয়েম (র) তাঁর 'আল-জওয়াব আল কাফী' বইতে লিখেছেন, প্রেমিক তার প্রেমিকাকে, আল্লাহকে যেরূপ ভালবাসা দরকার ঠিক তেমন ভালবাসে। ফলে, সে আকীদার ক্ষেত্রে কুফরী ও শিরক করে। কেননা, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে আল্লাহর মত বেশী ভালবাসা শিরক ও কুফরী। আর যদি সে ভালবাসা আল্লাহর চেয়েও বেশী হয়, তাহলে তা কঠোর কুফরী ও শিরক হবে। এর আলামত হলো, প্রেমিকার সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর অগ্রাধিকার দেয়া। যদি প্রেমিকার অধিকার

---

১. সাপ্তাহিক আল-মোসলেমুন, জেদ্দা–জুলাই, ১৯৯৭

ও আল্লাহর অধিকার একত্রিত হয়, তখন প্রেমিকার অধিকারকে অগ্রাধিকার দেয়, তার সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য দেয়, প্রেমিকার জন্য সর্বাধিক মূল্যবান নজরানা পেশ করে, আল্লাহর জন্য পেশ করে নিকৃষ্ট নজরানা, প্রেমিকার জন্য সময়ের সর্বাধিক কুরবানী দেয় ; পক্ষান্তরে সেখান থেকে একটু সময় বাঁচলে আল্লাহর জন্য তা ব্যয় করে। আল্লাহ্ শিরক ছাড়া অন্য গুনাহ্ মাফ করেন। কেবলমাত্র খাঁটি তাওবা অর্থাৎ 'তাওবা নাসুহা' করলেই আল্লাহ্ শিরক গুনাহ্ মাফ করেন।

প্রেমের আরেকটি ক্ষতিকর দিক হলো পরকিয়া প্রেম। অন্যের স্ত্রীর প্রতি লোভ ও পরে প্রেম-ভালবাসা সৃষ্টি হওয়া। এর মাধ্যমে তালাকেও আরেকটি পরিবার ধ্বংস হয় এবং সে ঘরের ছোট সন্তানাদির জন্য জাহান্নামের কষ্টের মত আযাব সৃষ্টি করা হয়। দুঃখের জোয়ারে দু পক্ষের কত লোকের সুখ-শান্তি যে ভেসে যায় তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যের পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়।

আল্লামা ইবনুল কাইয়েমের মতে, প্রেম এমন এক দুষ্ট ব্যাধি, ডাক্তার যার চিকিৎসায় অক্ষম, এটা এমন এক বিষ যার কুফল থেকে বাঁচা অসম্ভব। তিনি তাঁর একই বইতে আরো লিখেছেন, প্রেম হচ্ছে এক বিরাট জুলুম। কেননা, এর ফলে প্রেমিক নিজ পরিবার, সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজনের বিরাট ক্ষতি করে। এটা প্রেমিকের পরিবারের উপর বিরাট আগ্রাসন।

এক পর্যায়ে প্রেমিক নিজের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য জিন, শয়তান ও যাদুর আশ্রয় গ্রহণ করে আরো বড় শিরকে লিপ্ত হয়। প্রেমিকা ছলনা ও কৃত্রিম সাজ-গোজ করে প্রেমিককে আকৃষ্ট করে তার পকেট খালি করে ফেলে।

প্রেমের আরো একটি ক্ষতি হলো, তা প্রেমিকের সকল শিরা-উপশিরা, মন-মগজ ও চিন্তা-ভাবনা দখল করে নেয়। ফলে, তার পক্ষে নিজ জীবনের কল্যাণমূলক কোনো কাজে অগ্রসর হওয়া কিংবা সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়।

এর আরেক ক্ষতি হলো, তা প্রেমিককে অবৈধ যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে যা বিরাট গুনাহর কাজ। এর ফলে, এইড্‌স রোগ, সিপিলিস সহ বহু সংক্রামক ব্যাধির শিকার হয়, অবৈধ সন্তান প্রসব করে এবং পরে ঐ জারজ সন্তানকে হত্যা করে। তাহলে, একই সাথে কুফরী ও কবীরা গুনাহ একত্রিত হয়ে ক্ষতির মাত্রা দ্বিগুণ বাড়ায় এবং দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তিকে ধ্বংস করে দেয়।

ব্যভিচার নেক ও দীনদারী, সম্মানবোধ ও মহত্বকে শেষ করে দেয়। তাছাড়া এটা অভাব-দারিদ্র্যেরও অন্যতম কারণ। ব্যভিচারীর চেহারায় মানবতার পরিবর্তে পাশবিকতার চিত্র ফুটে উঠে এবং মন থেকে মধুরতা বিদূরিত হয়।

প্রেমের কারণসমূহ

আমরা এতক্ষণ প্রেমের ক্ষতিগুলো তুলে ধরলাম। এগুলো থেকে তাওবা করে ফিরে আসা প্রতিটা মু'মিনের কর্তব্য। এখন আমরা কি কি কারণে প্রেমিক প্রেম করে সেগুলো আলোচনা করবো।

১. আল্লাহ থেকে বিমুখ হওয়া ঃ আল্লাহ বান্দার সকল সম্পদ। তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে তাকে ঘাঁটে ঘাঁটে অপমান ও মন্দের গ্লানি পোহাতে হবে। প্রেম সেরূপ এক গ্লানি। আল্লাহ প্রেমিক কখনও অন্যের প্রতি প্রেম নিবেদন করতে পারে না।

২. প্রেমের ক্ষতি সম্পর্কে অজ্ঞতা ঃ প্রথম প্রথম প্রেম সকল কিছুর ঊর্ধে মনে স্থান করে নেয়। তখন এর ভাল-মন্দ বিবেচনা করার মত চেতনা থাকে না।

৩. অবসর সময় ঃ অবসর সময়কে কাজে লাগানোর জন্য এটাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। অথচ মু'মিনের অবসর থাকাই উচিত নয়। আল্লাহর ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনামুক্ত মন প্রেমের উর্বর ময়দান।

৪. তথ্য মাধ্যমের আগ্রাসন ঃ রেডিও, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট চ্যানেল, ইন্টারনেট, অশ্লীল ফিল্ম, ভিডিও, ম্যাগাজিন ও পর্ণোগ্রাফি আজকাল অবৈধ প্রেম-ভালবাসার চারণক্ষেত্র। এগুলো অবৈধ প্রেম-ভালবাসার জন্ম দেয় ও লালন-পালন করে। উপন্যাস ও গল্পের বইতে প্রেম-ভালবাসার উপস্থাপনা অবৈধ প্রেমের উত্তেজক ও উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে।

৫. প্রেমের অন্ধ অনুসরণ ঃ প্রেমের কাহিনী পড়ার পর কিংবা বন্ধুর প্রেমের খবর জানার পর নিজেও সে পিচ্ছিল পথে পা বাড়ায়। এর ফলে নিজের ভবিষ্যতকে ধ্বংস করে।

৬. ভালবাসার উপলব্ধি থেকে বিচ্যুতি ঃ ভালবাসা হওয়া দরকার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য। একে অন্যের জন্য নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে এর মৌলিক অর্থের বিচ্যুতি ঘটে। মহানবী (স) বলেছেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ-অভ্যাস পাওয়া যাবে সেই ঈমানের আসল স্বাদ লাভ করবে। ১. অন্যান্য সকলের অপেক্ষা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হবে তার কাছে সর্বাধিক প্রিয়তম। ২. কেবলমাত্র আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের লক্ষেই কাউকে ভালবাসবে এবং ৩. আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতই কুফরীতে পুনরায় প্রত্যাবর্তনকে অপসন্দ করবে।–বুখারী, মুসলিম

৭. পর্দাহীনতা, উলংগপনা ও বেহায়াপনা ঃ এর প্রতি বিষাক্ত দৃষ্টি পড়লে তা মনের উপর বিষের ক্রিয়া করে। তাই এ ব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য পর্দা প্রথা রাষ্ট্রীয়ভাবে বাধ্যতামূলক করা দরকার। আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে পর্দা প্রথা মেনে চলা প্রয়োজন।

মানব জীবনে, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীর জীবনে অবৈধ প্রেম-ভালবাসার চর্চা পরমাণু বোমার মতই ধ্বংসাত্মক। ক্যারিয়ার গঠনের এ পর্যায়ে তা ক্যারিয়ারকে পূর্ণ বা আংশিক ধ্বংস করে দেয়। এটা এক মারাত্মক রোগ যার প্রতিকার ও প্রতিষেধক উভয়টি দরকার।

অবৈধ প্রেম-ভালবাসা থেকে বাঁচার উপায় হলো ঃ

১. এখলাস ঃ ইবাদাতে আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা প্রয়োজন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন ঃ কেউ আল্লাহর ইবাদাতের স্বাদ গ্রহণ করলে তার কাছে এখলাস ছাড়া আর কোনো জিনিস বেশী প্রিয় ও মিষ্টি হবে না। আল্লাহকে ভালবাসতে পারলে এর পরিবর্তে অন্য প্রেমিকাকে ত্যাগ করা সম্ভব। বান্দার মনে এখলাস স্থান পেলে, আল্লাহ তার অন্তরকে জীবিত করে দেন এবং খারাপ ও মন্দ জিনিসকে তার মন থেকে সরিয়ে দেন। তখন মন পূত-পবিত্র ও নিষ্কলুষ হয়ে যায়।[১]

আল্লামা ইবনুল কাইয়েম (র) বলেন, মনের মধ্যে হেয়ালি ও ধাঁধা থাকে, আল্লাহর দিকে পূর্ণ প্রত্যাবর্তন তা দূর করে দেয় ; মনের মধ্যে থাকে শুষ্কতা ও ভীতি, নির্জনে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা তাকে দূর করে। তাতে রয়েছে পেরেশানী। আল্লাহর পরিচয় অন্তরে আনন্দ সৃষ্টি করে ; মনের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ তাঁর সাথে নির্জন বৈঠক দ্বারা দূর হয় ; মনের আছে বঞ্চনা ও না পাওয়ার ব্যথা-বেদনা ও আফসোস, আল্লাহর আদেশ পালন ও নিষেধ থেকে বিরত এবং ধৈর্যের সাথে এগুলোর মুকাবিলার মাধ্যমে তা দূর হতে পারে ; অন্তরের রয়েছে কঠোর চাহিদা, একমাত্র আল্লাহর প্রতি আকাঙ্ক্ষাই তা দূর করতে পারে ; মনের অভাব অনটন দূর হতে পারে কেবলমাত্র তাঁর ভালবাসা দ্বারা ; সর্বদা আল্লাহর স্মরণ, নির্ভেজাল এখলাস ও তাঁর দিকে সঠিক প্রত্যাবর্তন ছাড়া বান্দার এ অভাব কখনো পূরণ হতে পারে না।[২]

২. দোয়া ঃ এ রোগে আক্রান্ত রোগী আল্লাহর কাছে করুণভাবে দোয়া করলে তা থেকে মুক্তি পেতে পারে। দোয়া দ্বারা বিপদ দূর হয়।

---

১. আল-উবুদিয়াহ–ইবনুল কাইয়েম।

২. ঐ

৩. চোখ অনবত রাখা ঃ চোখ অবনত রাখলে এবং পর্দা লংঘন না করলে অন্তরে প্রশান্তি আসবে এবং কামনা-বাসনা দূর হবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ

"আপনি মু'মিনদেরকে বলে দিন তারা যেন নিজ চোখ অবনত রাখে এবং নিজ লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, এটা তাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র।"

–সূরা আন নূর ঃ ৩০

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেছেন, চোখ অবনত রাখ এবং লজ্জাস্থানের হেফাযত আত্মার জন্য সর্বোত্তম তাকওয়া ও পরিশুদ্ধির উপায়।[১]

ইবনুল জাওজী (র) বলেছেন, কোনো জিনিসের উপর নজর পড়লে তা যদি মনের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করে, তাহলে সাথে সাথে নজর সরিয়ে আনলে আর ভালবাসা জন্মে না। কিন্তু বেশী বেশী নজর কিংবা দীর্ঘস্থায়ী নজর দ্বারা অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি হতে পারে।[২]

অর্থাৎ প্রেমিকার প্রতি বেশী না তাকালে মনে প্রেম জন্মাবে না। চোখ অবনত রাখলে মনে কোনো আফসোস সৃষ্টি হয় না। মনকে খারাপ জিনিস থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে অন্তরে জ্ঞান, দূরদর্শিতা ও ভাল কাজের আগ্রহ জাগে।

৪. চিন্তা-ভাবনা করা ঃ প্রেমিকের উচিত, প্রেমিকার সাথে সাক্ষাতের জন্য তার প্রতিটি পদক্ষেপের হিসেবের বিষয়ে চিন্তা করা, প্রতিটি কথার জন্য তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে হবে। কামনা-বাসনা ধ্বংসকারী মৃত্যুর অধিক অধিক চিন্তা তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। তাকে ভাবতে হবে, এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার প্রেম সম্পর্কিত প্রতিটি কথা ও কাজের জন্য হিসেব দিতে হবে। হাশরের দিন কোটি কোটি মানুষের সামনে প্রেমিকার উপস্থিতিতে তার সাথে কথা বলার স্থান, বাক্যাবলী ও অন্যান্য আচরণ তুলে ধরা হবে, তখন সে লজ্জা কিভাবে ঢাকবে ?

৫. প্রেমিকা থেকে দূরে থাকতে হবে। বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে প্রেমের কথা মনে পড়বে না। অবসর সময়কে উপকারী অনেক কাজে নিয়োজিত করতে হবে। এতে রক্ষা পাওয়া যাবে।

৬. বিয়ে-শাদী করা ঃ বিয়ে করলে প্রেমের কলুষতা ও বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তাই সামর্থ থাকলে অনতিবিলম্বে বিয়ে করা উচিত।

---

১. আল এশক–হাকীকাতুহু, খাতারুহু, আসবাবুহু, এলাজুহু–মোহাম্মাদ বিন ইবরাহীম হামাদ–ন্যাশনাল গার্ড নির্দেশনা কমিটি–রিয়াদ প্রকাশকাল-২০০২।

২. ঐ

৭. **রোগী দেখা, জানাযায় অংশগ্রহণ ও কবর যেয়ারত ;** এগুলো মনের মধ্যে প্রেমের অবৈধ আগুনে পানির কাজ করবে।

৮. দীনি আলোচনা সভা ও মজলিশে অংশগ্রহণ করলে এর বরকতে তা থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

৯. **প্রেমিকার জীবনের দোষ-ত্রুটিগুলো স্মরণ করা ;** ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি মানব মনের আকর্ষণ কম থাকে। তখন উল্টো, ভাল গুণাবলী সম্বলিত জীবন সঙ্গী লাভ করার চিন্তা জাগ্রত হয়।

১০. **প্রেমিকাকে হারানোর চিন্তা-ভাবনা করা ;** যেমন যদি তার মৃত্যু হয়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি তার সাথে বিচ্ছেদ ঘটে কিংবা সে যদি দেশ বা ঐ অঞ্চল ত্যাগ করে, কিংবা মারাত্মক রোগ-ব্যধির শিকার হয়। তখন কি তাকে ভুলতে হবে না ? তাহলে এখন ভুলা যাবে না কেন ? সবই সম্ভব। এজন্য শক্ত মনের দৃঢ় সিদ্ধান্ত দরকার।

নগ্ন পত্র-পত্রিকা, অশ্লীল সাহিত্য-উপন্যাস, নীল ছবি, সিনেমা, টিভি ও ডিশ এন্টিনার প্রভাব রয়েছে প্রেমের উপর। প্রেম বন্ধের জন্য জাতীয় উদ্যোগ ও পর্দা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা জরুরী।

যেনা-ব্যভিচারের পরিণতি ও তা থেকে বাঁচার উপায়

আল্লাহ যেনা-ব্যভিচারকে হারাম করেছেন। কেননা, তা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য ধ্বংসাত্মক। এর ফলে বংশ নষ্ট ও বিশৃংখল হয় ; শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। দুর্ভিক্ষ ও গযব দেখা দেয়, ব্যক্তির আল্লাহভীতি নষ্ট হয়, ব্যক্তিত্ব শেষ হয়ে যায়, আত্মমর্যাদা কমে যায়। কোনো ব্যভিচারী পরহেজগার হয় না, প্রতিশ্রুতি পূরণ করে না, সত্য কথা বলে না, বন্ধুত্বের অধিকার আদায় করে না এবং নিজ পরিবারের জন্য তার আত্মমর্যাদা অবশিষ্ট থাকে না। সে নোংরা ও হীন জিন্দেগী যাপন করে। ভদ্রতা-সভ্যতা বিদায় নেয়।

যেনার কুফল

১. নিষিদ্ধ কাজের আদেশ লংঘনের কারণে আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জন।

২. চেহারা কাল হয়ে যায় এবং ক্লান্ত শ্রান্ত দেখায়।

৩. অন্তর অন্ধকার হয়ে যায় এবং নূর মিটে যায়, মনের সংকীর্ণতা দেখা দেয়।

৪. পরে হলেও ব্যভিচারীর অভাব দেখা দেয়।

৫. আল্লাহ ও মানুষের চোখে হেয়প্রতিপন্ন হয়।

৬. নিকৃষ্ট গুণে বিশেষিত হয়। যেমন, ব্যভিচারী, ফাসেক, বিশ্বাসঘাতক।

৭. এইড্‌স, গণোরিয়া ও সিপিলিশ ধ্বংসাত্মক রোগের শিকার হয়।

৮. বেহেশতে উত্তম আবাসস্থলে হুরের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হবে।

৯. ব্যভিচারের সময় ঈমান তার থেকে কেড়ে নেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

لَايَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ -

"ব্যভিচারের সময় ব্যভিচারী মু'মিন থাকে না।"–বুখারী ও মুসলিম

অন্য এক হাদীসে এসেছে, জামা যেভাবে মাথার উপর দিয়ে খোলা হয়, তেমনি ঈমানও খুলে নেয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ "হে মুসলমানগণ! তোমরা ব্যভিচার বর্জন কর। কেননা, এর ৬টি শাস্তি রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি দুনিয়ায় এবং ৩টি পরকালে প্রকাশ পায়। যে তিনটি শাস্তি দুনিয়ায় হয় সেগুলো হল, তার চেহারার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়ে যায়। আয়ুষ্কাল সংকীর্ণ হয়ে আসে এবং দারিদ্র চিরস্থায়ী হয়। আর যে তিনটি আখেরাতে প্রকাশ পায় তাহলো, সে আল্লাহর অসন্তোষ, কঠিন হিসেব ও জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে।"–বায়হাকী

সামুরা বিন জুনদুব থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, নবী করীম (স) স্বপ্নে দেখেন যে, জিবরীল ও মিকাঈল আমার কাছে আসল এবং আমি তাদের সাথে রওনা দিলাম। যেতে যেতে আমরা একটি চুল্লীর কাছে পৌঁছলাম। চুল্লীটির উপরিভাগ সংকীর্ণ ও নিম্নভাগ প্রশস্ত। ভেতরে বিরাট চিৎকার ও হৈ চৈ শোনা যাচ্ছিল। আমরা চুল্লীর ভেতরে উলঙ্গ নারী-পুরুষদেরকে দেখতে পেলাম। কিছুক্ষণ পরপর তাদের নীচ থেকে আগুনের একটা ঝটকা আসছে এবং তারা আগুনের তীব্র দহনে জোরে জোরে চিৎকার করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ "হে জিবরাঈল, এরা কারা ? তিনি বলেন ঃ এরা ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ।"–বুখারী

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহর সাথে শরীক করার পর বেগানা তথা নিষিদ্ধ নারীর সাথে যেনা করার মত বড় গুনাহ আর নেই।–আহমদ, তাবরানী

মহানবী (স) আরো বলেন ঃ জাহান্নামে একটা হ্রদ আছে। এর নাম দুঃখের হ্রদ। তাতে বহু সাপ-বিচ্ছু বাস করে। প্রতিটি বিচ্ছু এক একটা খচ্চরের মত বড় বড়। প্রত্যেক বিচ্ছুর ৭০টা হুল আছে। প্রত্যেক হুল বিষে পূর্ণ। সে বিচ্ছু ব্যভিচারীকে দংশন করবে এবং সমস্ত বিষ তার দেহে ঢেলে দেবে। ফলে সে এক হাজার বছর পর্যন্ত বিষের যন্ত্রণা ভোগ করবে। তারপর

তার শরীরের গোশত খসে পড়বে এবং লজ্জাস্থান থেকে পুঁজ ও পঁচা তরল পদার্থ বের হতে থাকবে।

নবী (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মদ পান অব্যাহত রাখা অবস্থায় মারা যায় আল্লাহ তাকে গুতা নামক ঝর্ণার পানি পান করাবেন। গুতা হচ্ছে ব্যভিচারীণী নারীদের লজ্জাস্থান থেকে নির্গত পুঁজ ও দূষিত তরল পদার্থের ঝর্ণা যা জাহান্নামে প্রবাহিত থাকবে।–আহমদ

আমরা যেনা-ব্যভিচারের কঠোর শাস্তি ও পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারলাম। আল্লাহকে ভয় করে তাঁর নিম্নোক্ত আদেশ মানা খুবই জরুরী।

আল্লাহ কুরআনে বলেন ঃ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا "তোমরা যেনা-ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না।"

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

"হে কুরাইশ যুবকেরা ! তোমরা লজ্জাস্থানের হেফাযত করো। যেনা-ব্যভিচার করো না। জেনে রাখ, যে নিজ লজ্জাস্থানের হেফাযত করে তার জন্য রয়েছে জান্নাত।"–তাবরানী, হাকেম, বায়হাকী।

আল্লামা নাসেরুদ্দীন আলবানী এটাকে সহীহ্ হাদীস বলেছেন।–বিশুদ্ধ হাদীস সিরিজ-৬নং খণ্ডের ২য় ভাগ, হাদীস নং-২৬৯৬।

যৌন তাড়না থেকে বাঁচার উপায়

বিয়ে করতে অক্ষম লোকদের যৌন তাড়না কমানোর লক্ষে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা দরকার।

১. বেশী বেশী নফল রোযা রাখা। এর ফলে শরীরের কামনা-বাসনা অবদমিত হয় এবং ব্যভিচারের ফেতনা থেকে বাঁচা যায়। হাদীসে এ রোযাকে যৌন কামনার প্রতিরোধে ঢালের সাথে তুলনা করা হয়েছে।–বুখারী, মুসলিম

২. বেপর্দা মহিলা কিংবা উলঙ্গ ও অর্ধোলঙ্গ নারীর প্রতি না তাকানো। মু'মিন নারী-পুরুষকে চোখ অবনত করে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

–সূরা আন নূর ঃ ৩০-৩১

৩. নারী-পুরুষের সহ অবস্থান নিষিদ্ধ। নারী ও পুরুষের কর্মস্থল আলাদা হওয়া জরুরী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও পৃথক হতে হবে। সহ অবস্থান বা একই প্রতিষ্ঠানে এক সাথে চাকুরী করলে যৌন তাড়না বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা নিষেধ করে বলেছেন, 'তোমরা যেনার কাছেও যেয়ো না।' অর্থাৎ যেনা তো দূরের কথা বরং যে কাজ বা পরিবেশ যেনার নিকটবর্তী করে তার কাছে যাওয়াও নিষিদ্ধ।

৪. যৌন বিষয়ক ফিল্ম, বই, পত্রিকা ইত্যাদি না দেখা ও না পড়া। এগুলো যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তাই এগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে।

৫. নিম্নোক্ত কাজগুলো বিয়ে করতে অক্ষম লোকদের জন্য খুবই উপকারী ঃ সময়কে ব্যস্ত রাখার জন্য বেশী বেশী নফল নামায, কুরআন তেলাওয়াত, হাদীস অধ্যয়ন, নবী চরিত পাঠ করা, কাজে ব্যস্ত থাকা, গবেষণা করা, চিত্রাঙ্কন, ছবি অংকন, যেমন নদী, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি।

৬. ব্যায়াম করা ঃ এতে করে শরীর ভাল হবে। এজন্য কোনো ব্যায়াম ক্লাবের সদস্যপদ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭. বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ঃ যেমন বৈধ খেলাধূলা, ভারোত্তলন, দৌড় প্রতিযোগিতা, ঘোড় দৌড়, তীর নিক্ষেপ, সাঁতার, রচনা ও সাহিত্য প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

৮. রেডিও-টেলিভিশন ও ইন্টারনেটের ইসলামী প্রোগ্রাম দেখা এবং পত্র-পত্রিকার ইসলামী পাতাগুলো পড়া। এগুলোতে লেখার মাধ্যমে অংশগ্রহণের চেষ্টাও করা যেতে পারে।

যেনা-ব্যভিচার থেকে বাঁচার আশ্চর্য কাহিনী

কিছু স্মরণীয় কাহিনীর মাধ্যমে যেনা থেকে বাঁচার পদ্ধতি আলোচনা করছিঃ

এক ঃ বর্ণিত আছে, এক মুসলিম যুবক মহানবী (স)-এর কাছে এসে যৌন তাড়নার বশবর্তী হয়ে যেনার অনুমতি চাইল। লোকেরা তাকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করতে লাগল এবং বললো, থাম, থাম। নবী করীম (স) বলেন, তাকে আমার কাছে আসতে দাও। যুবকটি নবী (স)-এর কাছে গিয়ে বসলো। নবী করীম (স) তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি তা তোমার মায়ের জন্য পসন্দ কর ? সে বললো, আল্লাহর কসম, কখনো না ; আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গকৃত করুন।' তিনি বলেন, 'লোকেরাও তা আপন মায়েদের জন্য পসন্দ করবে না।' তিনি আবার প্রশ্ন করেন, 'তুমি কি তা তোমার মেয়ের জন্য পসন্দ কর ? সে উত্তরে বললো, 'কখনো না, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত করুন। তিনি বলেন, লোকেরাও তেমনি তা নিজেদের মেয়েদের জন্য পসন্দ করবে না। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেন, "তুমি কি তা তোমার বোনের জন্য পসন্দ কর ? সে বললো, কস্মিনকালেও না ; আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গী প্রাণ করুন।' তিনি বলেন, লোকেরাও তেমনি তা তাদের বোনদের জন্য পসন্দ করবে না।' তিনি

আবারও প্রশ্ন করেন, 'তুমি কি তা তোমার ফুফুর জন্য পসন্দ কর ?' সে বললো, না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ প্রাণ করুন। তিনি বলেন, লোকেরাও তেমনি তা তাদের ফুফুদের জন্য পসন্দ করবে না।' তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেন, তুমি কি তা তোমার খালার জন্য পসন্দ কর ?' সে জবাবে বললো, না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ প্রাণ করুন।' তিনি বলেন, লোকেরাও তেমনি তা আপন খালাদের জন্য পসন্দ করবে না।' তারপর নবী (স) যুবকটির বুকে হাত রেখে দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ حَصِّنْ فَرْجَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَاغْفِرْ ذَنْبَهُ -

"হে আল্লাহ, তুমি তার লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত কর, তার অন্তর পবিত্র কর এবং তার গুনাহ্ মাফ কর।"

যুবকটি বলল, আমি যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে প্রবেশ করি, তখন যেনা আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ছিল। আর যখন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেই, তখন যেনা আমার কাছে সর্বাধিক ঘৃণিত জিনিসে পরিণত হল।- (আহমদ, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আলবানী একে সহীহ্ হাদীস বলেছেন)। রাসূলুল্লাহ (স)-এর দোয়া কবুল হওয়ায় তার ঐ পবিত্র মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে এবং গুনাহর মানসিকতা দূর হয়েছে। নবী করীম (স) তাকে ধমক না দিয়ে যুক্তি ও স্নেহ সহকারে তাকে বুঝিয়েছেন। আমাদেরও একই পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত।

আজও যারা এ জাতীয় সমস্যার শিকার তারা নবী (স)-এর অনুসরণে আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করতে পারেন ঃ

اَللّٰهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِيْ وَطَهِّرْ قَلْبِيْ وَاغْفِرْ ذَنْبِيْ -

"হে আল্লাহ, আমার লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত কর। আমার অন্তরকে পবিত্র কর এবং আমার গুনাহ মাফ কর।"

নিজের মা, বোন, খালা সহ আপনজনদের সাথে কারো যেনা-ব্যভিচারকে বরদাশত করা যায় না। তাহলে ব্যভিচারী যখন ঐ কুকর্মে লিপ্ত হয়, তখনও তো সে কারো না কারো মা, বোন ও খালার সাথেই লিপ্ত হবে। মনে কামভাব সৃষ্টি হলে ঐ কথা মনে করে সরে আসতে হবে। আর আল্লাহর কাছে লজ্জাস্থানের হেফাজতের জন্য দোয়া করতে হবে।

দুই ঃ এ যুবকের কাহিনী বিশেষভাবে শিক্ষণীয়।[১] হোসাইন বিন আবদুর রহমান বলেন ঃ মদীনার এক যুবক ২য় খলীফা হযরত ওমার বিন খাত্তাবের

১. রাওদাতুল মোহেব্বীন ওয়া নাজহাতুল মোশতাকীন–ইবনুল কাইয়েম আল-জাওজিয়া। সৌজন্যে–দৈনিক আল-মদীনা, জেদ্দা-১৬-৭-২০০০

সাথে নিয়মিত মসজিদে নবওয়ীতে ৫ ওয়াক্ত নামায পড়তেন। যুবকটি কোনো দিন মসজিদে না আসলে তিনি তার খোঁজ নিতেন। মদীনার এক মহিলা যুবকটির প্রতি আসক্ত হল। মহিলাটি এ বিষয়ে অন্য এক মহিলার সাথে আলাপ করল। মহিলাটি বলল, আমি তাকে তোমার কাছে হাজির করার ব্যাপারে একটি ফন্দি করবো। মহিলাটি যুবকটির পথে অপেক্ষায় থাকেন। যুবকটি সে পথে যাওয়ার সময় মহিলাটি বলল আমি একজন বৃদ্ধা। আমার একটি ভেড়া আছে। আমি তার দুধ দোহন করতে পারি না। আপনি যদি এসে আমার ভেড়াটির দুধ দোহন করে দিতেন ! যুবকটি মহিলার ঘরে গেল, কিন্তু কোনো ভেড়া দেখল না। মহিলাটি বলল, আপনি বসুন, আমি তাকে নিয়ে আসছি। আচানক সে আসক্ত যুবতীটি হাজির হল। যুবকটি যুবতীকে দেখে ঘরের মেহরাবে গিয়ে বসে পড়ল। যুবতীটি যুবকটির কাছে ব্যভিচারের প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আল্লাহকে ভয় কর। যুবতীটি তার থেকে বিরত হল না এবং তার কথার প্রতি কর্ণপাত করল না। যুবকটি বারবার প্রত্যাখ্যান করায় যুবতী চীৎকার দিল। চারদিক থেকে লোকেরা আসল। যুবতী অভিযোগ করল, যুবকটি আমার কাছে এসে আমার সাথে ব্যভিচার করতে চায়। লোকেরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে মারল এবং রশি দিয়ে বেঁধে খলীফা ওমরের কাছে নিয়ে আসল। তিনি তাঁকে ফজরের নামাযে না দেখে চিন্তিত হলেন। ওমর তাকে দেখে মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, তার ব্যাপারে আমার ধারণা যেন পরিবর্তিত না হয়। তিনি তাদেরকে ঘটনা জিজ্ঞেস করেন। তারা বলল, রাত্রে এক যুবতী চিৎকার দিয়ে সাহায্য চাইল। আমরা গিয়ে যুবকটিকে সে যুবতীর কাছে পাই। আমরা তাকে মেরে বেঁধে নিয়ে এসেছি। ওমর যুবকটিকে ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় সে সব খুলে বলল। খলীফা জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি সে বৃদ্ধাকে চিন ? সে বলল ঃ 'হ্যাঁ', তাকে দেখলে চিনবো। হযরত ওমর সেই যুবতীর প্রতিবেশী সকল নারী ও বৃদ্ধাকে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। মহিলাদেরকে তার সামনে উপস্থিত করা হলে তিনি সে বৃদ্ধাকে চিনে ফেলেন। ওমর বৃদ্ধার উপর লাঠি ধরে বলেন ঃ সত্যি কথা বলবে তো ? বৃদ্ধাটি যুবক যা বলেছে তাই বলল। তখন ওমর (রা) বলেন ঃ সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমাদের মাঝে হযরত ইউসুফ (আ)-এর মত যুবকও রেখেছেন।

একজন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মুসলমান যুবক একজন অসৎ নারীর প্রলোভন থেকে বাঁচার জন্য মার খেল, শৃংখলবদ্ধ হল এবং বাহ্যিকভাবে অপমানিত হল। তথাপি সে যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হয়নি এবং তার ইজ্জত-সম্মান নষ্ট করেনি। সত্যবাদিতা, ধৈর্য ও এখলাসের কারণে আল্লাহ তার মুক্তি আসন্ন করে দিলেন

এবং ঘটনার মোড় পরিবর্তন করে দিয়ে দুনিয়ায় তার সম্মান কয়েকগুণ বেশী পুনর্বহাল করলেন। আর পরকালের মহান পুরস্কার তো আছেই।

মিসরে হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি আযীযের স্ত্রী জুলেখাও অনুরূপ প্রলোভন করেছিল। শেষ পর্যন্ত ইউসুফ (আ) জুলেখার অসৎ উদ্দেশ্য পূরণ করেননি। সে কারণে তাকেও কারাবরণ করতে হয়েছে। পরে আল্লাহ্ তাঁর নির্দোষিতা প্রমাণ করে জুলেখাকে দোষী প্রমাণিত করেছেন। মিসরের শাসক আযীযসহ সকলের কাছে তা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আজকের যুবকদেরকেও হযরত ইউসুফ (আ)-এর মত বলিষ্ঠ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, যদি তারা দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তি পেতে চায়।

তিন ঃ এবার বনী ইসরাঈলের এক যুবকের কাহিনী। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন যে, ওহাব বিন মোনাব্বেহ বলেন ঃ বনি ইসরাঈলের এক ইবাদাতগুজার বান্দাহ নিজ ইবাদাতগাহে ইবাদাতে মশগুল থাকতেন। কিছু খারাপ লোক সে আবেদকে গুনাহর মধ্যে লিপ্ত করার পরিকল্পনা নিল। তারা এক বেশ্যা মহিলার কাছে গেল এবং তাকে বলল ঃ ঐ আবেদের পেছনে লাগ। বেশ্যাটি এক বর্ষণ মুখর অন্ধকার রাত্রে আবেদের কাছে হাজির হল এবং বলল, হে আল্লাহর দাস, আমাকে তোমার কাছে আশ্রয় দাও। সে তখন বাতি জ্বালানো অবস্থায় নামায পড়ছিল। কিন্তু বেশ্যাটির প্রতি কর্ণপাত করল না। সে আবারও বলল, হে আল্লাহর গোলাম, এখন বৃষ্টি ও ঘোর অন্ধকার, আমাকে তোমার কাছে আশ্রয় দাও। সে এভাবে আকুতি জানাতে থাকল যে পর্যন্ত না আবেদটি তাকে আশ্রয় দিল। বেশ্যাটি শুয়ে পড়ল। যুবকটি নামায পড়তে থাকল। বেশ্যাটি ওলট-পালট করে যুবকটিকে নিজ সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে থাকল। শেষ পর্যন্ত যুবকের মনে দুর্বলতা দেখা দিল। হঠাৎ করে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল, না, হে মন ! আমি আগে আগুন বরদাশত করার ব্যাপারে তোকে পরীক্ষা করতে চাই। সে বাতির কাছে গেল। এবং একটি আঙ্গুল আগুনে ধরল। আঙ্গুলটি পুড়ে গেল। আবার জায়নামাজে ফিরে আসল। দ্বিতীয়বারও মনে আকর্ষণ সৃষ্টি হল। পুনরায় সে আগুনের কাছে গিয়ে সবগুলো আঙ্গুল আগুনে রাখল। এবার সব আঙ্গুল পুড়ে গেল। বেশ্যাটি তার এ অদ্ভুত আচরণ দেখে বেঁহুশ হয়ে গেল। শেষে মারা গেল। সকাল বেলায় লোকেরা কি ঘটল তা জানার জন্য আসল। তারা বেশ্যাকে মৃত দেখে চীৎকার দিয়ে বলল, হে আল্লাহর দুশমন ! ইবাদাত প্রদর্শনকারী ! তুমি তার সাথে ব্যভিচার করে তাকে হত্যা করেছ ? তারা তাকে বাদশাহর কাছে নিয়ে গেল এবং তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। বাদশাহ তাকে হত্যার আদেশ দিলেন। যুবক আবেদটি বলল, আমাকে দু' রাকাত নামায পড়ার সুযোগ দিন। সে নামায পড়ে দোয়া করল ঃ হে

আল্লাহ! তুমি সর্বজ্ঞানী ; আমি যা করিনি তুমি সে জন্য অবশ্যই আমাকে পাকড়াও করবে না। তোমার কাছে প্রার্থনা করি, আমি যেন গ্রামবাসীদের কাছে পরবর্তীতে অপমানিত ও নিন্দিত না থাকি। দোয়া কবুল হল। আল্লাহ বেশ্যার কাছে তার রূহ ফেরত পাঠান। বেশ্যা বলল ঃ 'তোমরা তার হাতের দিকে তাকাও।' তারপর সে আবার মৃত হয়ে গেল।

প্রশ্ন হল, যুবকটি কেন আগুনে আঙ্গুল পুড়াল ? জাহান্নামের ৭০ গুণ বেশী তেজী আগুন সহ্য করতে পারবে কিনা তা দেখা কি তার উদ্দেশ্য ছিল না ? আজ কি এরূপ ঈমানদার যুবকের প্রয়োজন নেই ?

চার ঃ ইমাম আহমদ (র) আরেক দীনদার যুবকের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ এক আবেদ ও নেককার যুবক এক মহিলার রান নিজ হাতে ধরল। তারপর তার অনুশোচনা হল। সে হাতটিকে আগুনের উপর ধরল। হাতটি জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে গেল। যেন খই ফুটছে। সে তা দেখে চোখের পানি ফেলল।

কিসের ভয় তাকে আগুনের আযাব ভোগ করতে উদ্বুদ্ধ করল ?

পাঁচ ঃ ইবনুল কাইয়েম অনুরূপ আরেক কাহিনী বর্ণনা করেছেন।[১] তিনি বলেছেন, এক বৈরাগী তার গীর্জায় ইবাদাত করতো। একদিন সে গীর্জা থেকে বাইরে উঁকি মারল। এক মহিলাকে দেখে তার প্রতি আশক্ত হল। সে মহিলাটির কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে গীর্জা থেকে পা বাড়াল। হঠাৎ তার ঈমান তার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করল। সে বলল ঃ হে পা, তুই আল্লাহর নাফরমানী করার জন্য গীর্জা থেকে বের হয়েছিস ! আল্লাহর কসম, তুই আমার সাথে আর গীর্জার প্রবেশ করতে পারবি না। সে পা গীর্জার বাইরে ঝুলিয়ে রাখল। এর উপর বরফ ও বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকল। পায়ের হাড্ডি-মাংস ঝরে পড়ল। আল্লাহ তার এ কাজে খুশী হলেন।

আল্লাহ পাপ কাজের জন্য মানুষকে জিজ্ঞেস করলে তার হাত-পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দেবে। এ ঘটনা সে কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

ছয় ঃ জাবের বিন নূহ বর্ণণা করেছেন ঃ আমরা মদীনায় বসা ছিলাম। এক সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট বৃদ্ধ আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে শোকে-দুঃখে ভারাক্রান্ত দেখাচ্ছিল। আমরা তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলাম এবং দোয়া করলাম। বৃদ্ধ লোকটি আনসার ছিলেন। তাঁর ছেলের মৃত্যুর দুর্ঘটনায় তিনি শোকাবিভূত। ছেলেটি ছিল বাপের অনুগত। কিন্তু তার মৃত্যু ছিল এক বিরাট দুঃখজনক ঘটনা।

---

১. দৈনিক আল-মদীনা, জেদ্দা, জুলাই-২০০০।

এক মহিলা তাকে ভালবাসল। তার কাছে ভালবাসার পয়গাম পৌঁছাল এবং তাকে সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ জানাল। মহিলাটির স্বামী ছিল। তা সত্ত্বেও সে যুবকটিকে পাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখল। যুবক তার এক বন্ধুর কাছে ঘটনাটি খুলে বলল। বন্ধু পরামর্শ দিল ঃ তুমি যদি তোমার পরিবারের কোনো মহিলাকে তার কাছে পাঠিয়ে তাকে উপদেশ এবং ভর্ৎসনা করাও, তাহলে সে তোমার থেকে বিরত হবে। যুবকটি তা করল না। মহিলাটি তার কাছে পুনরায় পয়গাম পাঠাল, হয় তুমি আমার সাথে সাক্ষাত কর, না হয় আমি তোমার সাথে সাক্ষাত করি। কিন্তু যুবকটি অস্বীকার করল। তারপর মহিলাটি নৈরাশ হয়ে এক মহিলা যাদুকরের শরণাপন্ন হল এবং বহু টাকা-পয়সা দিয়ে যাদু করল। এক রাতে যুবকটি তার বাপের কাছে ছিল। তার মনে হঠাৎ করে মহিলাটির কথা স্মরণ হল এবং তার প্রতি অপূর্ব আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়ল। সে দ্রুত দাঁড়াল এবং আশক্তির মনোভাব কঠিন থেকে কঠিনতর হল। সে তার পিতাকে বলল ঃ হে পিতা ! আমি যাদু বেষ্টিত। বাপ জিজ্ঞেস করল, তোমার ঘটনা কি ? ছেলেটি ঘটনা খুলে বলল। বাপ তাকে ঘরে বেঁধে রাখল। সে রশিতে বাঁধা বলদের মত আওয়াজ দিতে থাকল এবং খুবই ছটফট করছিল। এক পর্যায়ে শান্ত হল। কিন্তু দেখা গেল সে মৃত। তার কাঁধ থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল।[১]

দুনিয়ার কামনা-বাসনাকে উপেক্ষা করে যাদুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে ঈমান রক্ষার জন্য নিজের জানকে বিলিয়ে দিল, তথাপি অশ্লীল ও গুনাহর কাজে পা বাড়ায়নি। যুগে যুগে এরূপ ঈমানদার যুবকেরই প্রয়োজন।

❒ এতক্ষণ আমরা মর্দে মোজাহিদ যুবকের কথা আলোচনা করেছি। এবার আমরা একই ধরনের মোজাহিদ যুবতি সম্পর্কেও আলোচনা করবো।

এক ঃ আবু ওসমান তামীমি থেকে বর্ণিত।[২] এক ব্যক্তি পরমা সুন্দরী এক বৈরাগীনীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বৈরাগিনীর প্রতি আকৃষ্ট হল। সে বৈরাগিনীর কাছে গিয়ে তার সাথে ব্যভিচারের ইচ্ছা পোষণ করল। মহিলা রাজী হয়নি। বরং সে বলল ঃ যা দেখছ, তা দেখে ধোঁকা খেয়ো না। এর পেছনে আর কিছু নেই। শেষ পর্যন্ত পুরুষটি সে মহিলাকে জোরপূর্বক কাবু করে ফেলল। মহিলার পাশে ছিল জ্বলন্ত কয়লাদানী। মহিলা তাতে নিজ হাত রাখল। হাত পুড়ে গেল। লোকটি নিজ কাজ সিদ্ধির পর বৈরাগিনীকে বলল, তুমি কেন এমন করলে ? বৈরাগিনী বলল ঃ তুমি যখন আমাকে জবরদস্তি করলে, আমার

১. দৈনিক আল-মদীনা, জেদ্দা-১৬-৭-২০০০

২. মাচারে' আল-ওশ্শাক ইবনুস সেরাজ-সৌজন্যে, দৈনিক আল-মদীনা, জেদ্দা, ২৩-৪-২০০০।

ভয় জাগল যে, আমিও তো তোমার সাথে আনন্দের শরীক হতে যাচ্ছি। তাহলে আমি কি গুনাহর কাজে তোমার সাথে শরীক হবো ? সে জন্য আমি এ কাজ করেছি। লোকটি বললো ঃ আল্লাহর কসম, আমি আর কখনও গুনাহর কাজ করবো না। এ বলে সে গুনাহ্ থেকে খালেস তাওবা করে নিল।

এ ঘটনায় একজন দীনদার মহিলা কিভাবে পাপ থেকে এমন কি জোরপূর্বক অবস্থায়ও বাঁচার যে কঠোর চেষ্টা করল এবং শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতার গ্লানি দুনিয়াতেই পোহাল, জাহান্নামের আগুনকে সে কতবেশী ভয় করত, এ ঘটনা তার আলোকোজ্জ্বল শিক্ষা। সে জবরদস্তি অবস্থায়ও আল্লাহকে ভুলেনি এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আনন্দের বিনিময়ে জান্নাতের চিরস্থায়ী আনন্দ বিস্মৃত হয়নি। তাকে মেরে, না রশি দিয়ে বেঁধে জোরপূর্বক ব্যভিচার করেছিল, সেটা জানা যায়নি। তবে সে আগুনের দহন দ্বারা কামনা-বাসনা থেকে দূরে থাকার জন্য আত্মাকে শিক্ষা দিয়েছে।

দুই ঃ বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তার চাচাত বোনকে বেশী ভালবাসত। সে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। যুবতীটি তাতে রাজী হয়নি। যুবতীটি ছিল খুবই আবেদ ও পরহেজগার। বিয়েতে ব্যর্থ হয়ে সে তার সাথে ব্যভিচার করতে চেয়েছিল। যুবতীটি তাতেও রাজী হয়নি। বরং তাকে ওয়াজ-নসীহত করল এবং আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিল। কিন্তু সে উপদেশ শুনার লোক নয়। পরিস্থিতি সীমালংঘনের পর্যায়ে পৌছল। যুবতীটি বলল, আমি তোমার প্রস্তাবে এক শর্তে রাজী। যুবকটি বলল, আমি অবশ্যই সে শর্ত পূরণ করবো। যুবতী বলল, তুমি ৪০ দিন মসজিদে জামাত সহকারে ফজরের নামায পড়বে। যুবকটি খুশী হয়ে ৪০ দিন মসজিদে জামাত সহকারে নামায পড়ল। ৪০ দিন শেষ হলে, সে যুবতীর কাছে গিয়ে শর্ত পূরণের কথা জানায় এবং ব্যভিচারের প্রস্তাব দেয়। যুবতীটি বলল ঃ তুমি কি ধরনের দাবী জানাচ্ছ ? তোমার নামায কি তোমাকে তোমার পাপী মনোভাবের পরিবর্তন ঘটায়নি ? আল্লাহর কসম, আমার ইচ্ছা ছিল, তোমার মনকে মসজিদের সাথে সংযুক্ত করে দিতে ; তুমি সেখানে আল্লাহর জিকর করবে, আল্লাহর বিরোধী অন্যান্য তৎপরতা ভুলে যাবে এবং কামনা-বাসনা ছেড়ে দেবে। কেননা কুরআনে আছে ঃ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ "নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও গুনাহর কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে।"

যুবকটি হতাশার সুরে বলে ঃ আমি কিন্তু বিনা অজুতেই ৪০ দিন নামায পড়েছি। একজন দীনদার যুবতী কি নিপুণ বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে সুকৌশলে একজন যুবককে গুনাহ থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল এ ঘটনা তারই প্রমাণ।

আজকের দীনদার-ঈমানদার যুবতীরাও বিভ্রান্ত যুবকদেরকে বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার সাথে পাপ থেকে বাঁচার ও সত্যের সন্ধান দিতে পারে।

তিন ঃ বুখারী শরীফের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আগের যুগে তিন যুবক বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য এক গুহায় আশ্রয় নিল। বিশাল পাথর পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তিন যুবক আল্লাহ্‌র কাছে নিজেদের অতীতের একটি করে নেক কাজের উসিলা দিয়ে দোয়া করল। আল্লাহ্‌ তাদের দোয়া কবুল করলেন এবং প্রতিজনের দোয়া শেষে একটু একটু করে পাথর সরে সবশেষে গুহার মুখ খুলে গেল এবং তারা রক্ষা পেল। তাদের একজন বর্ণনা করল, তার ছিল এক গরীব চাচাত বোন। সে খুবই রূপসী ও পরমা সুন্দরী ছিল। অভাবে পড়ে সে তার কাছে সাহায্যের জন্য আসল। যুবক তার সাথে ব্যভিচারের প্রস্তাব দিল। মহিলাটি তাতে রাজী হল না। কিছুদিন পর আবারও একই প্রস্তাব দেয়ায় যুবতীটি তা পুনরায় প্রত্যাখ্যান করল। কিছুদিন পর অভাবের তীব্রতায় অপরাগ হয়ে পুনরায় চাচাত ভাইয়ের কাছে সাহায্যের জন্য আসল। সে যখন তার সাথে ব্যভিচারের জন্য বসল, তখন যুবতীটি বলল, "হে অমুক, আল্লাহকে ভয় কর, আংটির হক আদায় না করে তা ভেঙ্গ না।" একথা শুনে তার শুভ বুদ্ধির উদ্রেক হল এবং নিজের ভুল ভাঙ্গল। কেননা, আল্লাহ্‌ তার এ কাজ দেখছেন। তখন সে উঠে দাঁড়াল এবং ব্যভিচার থেকে বিরত হল। এ নেকের উসিলায় আল্লাহ্‌ তার জন্য গুহার মুখ খুলে দিলেন। এমন কঠিন মুহূর্তে সে আত্মার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করল। এ জিহাদ তীর-তলোয়ারের জিহাদ অপেক্ষা আরো কঠিনতর। এজন্য নবী (স) বলেছেন ঃ 'সবচয়ে কঠিন জিহাদ হলো নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ।'

একবার নবী করীম (স) এক জিহাদ থেকে ফিরে এসে মন্তব্য করেছেন ঃ 'আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এসেছি।'

এ ঘটনায় যুবক-যুবতী উভয়েরই ঈমানী দৃঢ়তা, ধৈর্য-সবর ও কঠোর জিহাদী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে।

এ হাদীসে আত্মার বিরুদ্ধে জিহাদ শুধু পুরুষ কিংবা নারীর জন্য সীমাবদ্ধ নয় বলে বুঝা গেল। বরং উভয়ের জন্যই তা প্রযোজ্য। একপক্ষ আরেক পক্ষকে প্রয়োজনের মুহূর্তে উপদেশ দেবে এবং চরম ধৈর্য ও জিহাদের আহ্বান জানাবে। হারাম কামনা-বাসনার মধ্যে যে কেউ যে কোনো সময় ডুবে যেতে পারে। বর্তমান যুগে যৌন-কামনা-বাসনার যে সয়লাব চলছে, তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য এরূপ ইস্পাত কঠিন মনোভাবের অধিকারী যুবক-যুবতীর প্রয়োজন

সর্বাধিক। জ্বলন্ত আগুনের কয়লা হাতে রাখা যেমন কষ্টকর, তেমনি ঈমান রক্ষা করাও কষ্টকর।

ইমাম শাফেঈ (র) বলেছেন ঃ যে যেনা করে তার ঘরে অন্যরা এসে যেনা করবে। যেনা হল ঋণ, পরিবার তা পরিশোধ করে।[১]

উপরোক্ত ঘটনাগুলো প্রতিটি যুবক-যুবতীর জন্য জিহাদের বিরাট অস্ত্র। এ অস্ত্রে সজ্জিত হতে পারলে রোম সম্রাটের উপর হযরত আবদুল্লাহ বিন হোজাফার মত বিজয়ের মালা পরিধান করা সম্ভব। কঠিন কামনা-বাসনার মুহূর্তে যদি জাহান্নামের আগুনের কথা মনে পড়ে এবং আত্মাকে শাসনের জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে ৭০ গুণ কম তেজ দুনিয়ার আগুনের শরীরের অংশ বিশেষ জ্বালানোর ঘটনাবলী সামনে থাকে, তাহলে অবশ্যই আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। সাহায্যের মালিক আল্লাহ।

১৫. আয়ু বৃদ্ধি ও বার্ধক্য বিলম্বিত করার উপায়

আয়ু বৃদ্ধি

মানুষের আয়ু আল্লাহর বিশাল নেয়ামত ও কুদরত। আয়ু বৃদ্ধির জন্য সবাই লালায়িত। কেউ মরতে চায় না। যদিও মানুষ মাত্রই মরণশীল। আয়ু বাড়লে বা বাড়াতে পারলে নেককারদের সুবিধে। আরো বেশী নেক অর্জন করে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায়। পক্ষান্তরে পাপীদের জন্য তা পাপের বোঝা বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ তারা আরো পাপ করে বোঝা বাড়ায়। মহানবী (স) মানুষকে মৃত্যু কামনা থেকে বারণ করেছেন। বর্ধিত আয়ুকে নেক কাজের মধ্যে কাটানো দরকার। আয়ু বাড়লে স্বভাবতঃই যৌবনকালও দীর্ঘায়িত হবে।

আত্মীয়তার অধিকার পূরণ করলে আয়ু বাড়ে। মহানবী (স) বলেছেন ঃ

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ وَاَنْ يُّنْسَاَلَهُ فِيْ اَمْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ -

"যে ব্যক্তি রিয্ক ও হায়াত বৃদ্ধি কল্পে আনন্দিত হতে চায় সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে।"–বুখারী, মুসলিম

রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেছেন ঃ

مَكْتُوْبُ فِي التَّوْرَاةِ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّزَادَ فِيْ عُمْرِهِ وَيُزَادَ فِيْ رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ -

১. তাওজীহাত ইলা আসহাবিল ফিদিও ওয়াত তাসজীলাত–শেখ আবদুল্লাহ বিন জারুল্লাহ, সৌদী আরব।

"তাওরাতে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি আয়ু ও রিযক বৃদ্ধি করতে আগ্রহী, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে।"–বাজ্জার, হাকেম

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, দীর্ঘ আয়ু বিশিষ্ট মা-বাপের সন্তানেরা হায়াত বেশী পায়। তাই বিয়ের সময় তা বিবেচনা করতে পারলে ভাল হয়।

সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ وَلاَ يَرُدُّ الْقَدْرَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ إِلاَّ الْبِرُّ -

"বান্দা গুনাহর কারণে রিযক থেকে বঞ্চিত হয়। দোআ দ্বারাই কেবল তাকদীরের পরিবর্তন হয়। মা-বাপের আনুগত্য ও সেবার মাধ্যমেই কেবল আয়ু বাড়ে।"–ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান, হাকেম

ওলামায়ে কেরাম আয়ু বাড়ার ব্যাপারে তিন রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ১. আয়ু বাড়ার অর্থ হল বরকত হওয়া। ২. মৃত্যুর পরে লোকেরা ভালভাবে স্মরণ করবে। ৩. যথার্থ অর্থেই আয়ু বৃদ্ধি।

আল্লামা ইউসুফ আল-কারদাওয়ী বলেছেন ঃ 'মানুষের প্রকৃত বয়স জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্তকার সময় নয়। বরং তার আসল বয়স হল, আল্লাহর কাছে যে পরিমাণ সময়ের নেক আমল ও কল্যাণকর কাজ লেখা হয়েছে। যে ব্যক্তির বয়স ১শ বছরেরও অধিক, কিন্তু তার নেকের খাতায় শূন্য বা শূন্য বিয়োগ তাহলে তা কোন আয়ু নয়। পক্ষান্তরে অল্প বয়সের কোন যুবক মারা গেলে যদি তার আমলনামায় নেক ও পুণ্যের সমারোহ ঘটে, সেটাই বর্ধিত আয়ু।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ কেউ বয়সকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। ১. সময়ভিত্তিক আয়ু। ২. উৎপাদন বা আমল ভিত্তিক আয়ু। সময়ভিত্তিক আয়ু বছর, মাস, দিন, ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ড দ্বারা সীমিত। কেউ ইচ্ছা করলে এক মিনিট ও সেকেণ্ডও বাড়াতে পারে না। বরং আগের উম্মতদের তুলনায় শেষ নবীর উম্মতের হায়াত কম। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'আমার উম্মতের বয়স হল ৬০-৭০ এর মধ্যে। এ আলোকে মানুষের উৎপাদনমূলক গড় বয়স ২০ বছরের বেশী হয় না। তাই এই এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদনমূলক সময়ের সর্বাধিক সদ্ব্যবহার দরকার।

আল্লাহ এ উম্মতকে অল্প আমলের বিনিময়ে অধিক সওয়াব দানের ব্যবস্থা করেছেন। যেমন ঃ

১. নেক ও উন্নত চারিত্রিক গুণ দ্বারা উৎপাদনমূলক আয়ু বৃদ্ধি করা যায়। উদাহরণ ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক টিকিয়ে রেখে আত্মীয়দের অধিকার আদায় করা, নেক চরিত্র, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার ইত্যাদি।

২. অতিরিক্ত সওয়াব বিশিষ্ট নেক কাজ করা। উদাহরণ ঃ নামায, হজ্জ, ওমরাহ, মুআয্যিন হওয়া, রোযা রাখা, কদরের রাতের ইবাদাত করা যা ১ হাজার মাসের ইবাদাত অপেক্ষা উত্তম, জিলহজ্জ মাসের ১ম ১০ দিনের ইবাদাত, কুরআনের কিছু সূরার পুনরাবৃত্তি (সূরা এখলাস তিনবার পড়লে এক খতম কুরআনের সওয়াব পাওয়া যায়।)

৩. মৃত্যুর পরে কবরে সওয়াব পৌঁছায়–এমন নেক কাজ। যেমন–সদকাহ জারিয়াহ, এলেমের খেদমত, সন্তানের বা অন্যান্য মানুষের দোয়া।

বার্ধক্য বিলম্বিত করার উপায়

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ اَخِيْكَ صَدَقَةٌ

"তোমার ভাইয়ের দিকে হাসি মুখে তাকানো সাদকাহ।"

তিনি আরো বলেছেন ঃ

اِذَا اجْتَمَعَ الْمُسْلِمَانِ غَفَرَ اللّٰهُ لاَبَسِّهِمَا وَجْهًا ـ

"যখন দু'জন মুসলমান মিলিত হয়, হাসিমুখ বিশিষ্ট মুসলমানটিকে আল্লাহ ক্ষমা করেন।"

তিনি আরো বলেছেন ঃ

لاَتَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ تَلْقَى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ ـ

"যে কোন নেক কাজকে ছোট মনে কর না। তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে মিলিত হওয়াকেও না।"–মুসলিম, মুসনাদে আহমদ

রাসূলুল্লাহ (স) সর্বদা হাসিমুখে থাকতেন।

হাসিমুখে থাকার গুরুত্ব আগে বুঝা না গেলেও বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান এর উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিনংটন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডঃ কার্ল এজদোভার যৌবনকালকে স্থায়ী করার জন্য হাসিমুখে থাকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কেননা,

দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ অগ্রিম বার্ধক্য নিয়ে আসে। এর ফলে ধমনীতে রক্ত প্রবাহে এক ধরনের শৈথিল্য দেখা দেয় এবং একজিমা সহ বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হয়।[১]

অধ্যাপক সিমনভ বলেছেন, শরীরের চামড়ার উপর ধূমপানের প্রভাব পড়ে। ফলে, চামড়ার উপর অগ্রিম বার্ধক্যের ছাপ পড়ে। এ কারণে ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে।[২]

বৃদ্ধদের জন্য ভিটামিন 'এ' সহ বিভিন্ন রকম ভিটামিন দরকার হয়। এতে করে তাদের শরীরে শক্তি সঞ্চয় হয় এবং বার্ধক্যের জরাজীর্ণতা কিছুটা লাঘব হয়। পুষ্টিকর ও সুষম খাবার দ্বারাও বার্ধক্যকে বিলম্বিত করা যায়। ভাল খাবারের দাবী হল ব্যায়াম ও পরিশ্রম। পরিশ্রম ছাড়া ভাল খাবার হিতে বিপরীত হয়। বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগ দেখা দিতে পারে। দুশ্চিন্তা থেকেও ডায়াবেটিস হয়। তাই ইসলাম সর্বদা দুশ্চিন্তামুক্ত থাকার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে হাসিমুখে থাকাকে উৎসাহিত করে। দুশ্চিন্তা থেকে রক্তচাপও সৃষ্টি হয়। আজকাল প্রায় সকল রোগের পেছনে দুশ্চিন্তার প্রভাব রয়েছে। এ সকল রোগের ফলে শরীর দুর্বল হয়ে অকাল বার্ধক্য দেখা দেয়।

বর্তমান যুগে বার্ধক্যকে বিলম্বিত করার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের বহু গবেষণা চলছে। হতে পারে এর মাধ্যমে যৌবনের নবায়ন এবং বার্ধক্য বিলম্বিত হতে পারে।

কৃত্রিম যুবক সাজা জায়েয নেই। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'তোমাদের যুবকদের মধ্যে তারা উত্তম যারা বৃদ্ধদের বেশ ধারণ করে এবং তোমাদের বৃদ্ধদের মধ্যে তারা অধম যারা যুবকদের বেশ ধারণ করে।' বৃদ্ধদের বেশ ধারণ করার অর্থ হলো, গাম্ভীর্য ও ভদ্রতায় বৃদ্ধদের মত হবে, তাদের মত চুল সাদা করা নয়। আর যুবকদের বেশ ধারণ করার অর্থ হলো, কাল রং এর খেজাব লাগানো। হাদীসে একে জাহান্নামীদের খেযাব বলা হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় একে কাফেরদের খেযাব বলা হয়েছে।[৩]

খলীফা ওমর ফারুকের খেলাফতকালে, এক ব্যক্তি বিয়ে করে। সে কাল খেযাব লাগাত। চুলের গোড়ায় যখন সাদা বর্ণ ফুটে উঠলো তখন তার বার্ধক্য ধরা পড়ল। স্ত্রীর আত্মীয়েরা খলীফা ওমরের কাছে মামলা দায়ের করলো। ওমর (রা) ঐ বিয়ে ভেঙে দেন এবং স্বামীকে খুব মার দিয়ে বলেন ঃ তুমি বার্ধক্য গোপন করে তাদেরকে প্রতারিত করেছ।[৪]

---

১. দৈনিক আল মদীনা জেদ্দা, ৩০শে নভেম্বর, ১৯৯২
২. দৈনিক আল মদীনা জেদ্দা, ৩০শে নভেম্বর, ১৯৯২
৩. উলুমিদ্দিন–ইমাম গাজালী (র)। ৪. ঐ

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, শেষ যমানায় কিছু লোক কবুতরের পুচ্ছের মত কাল খেযাব লাগাবে। তারা জান্নাতের গন্ধও পাবে না।[১]

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত। আনাস বিন মালেক (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেযাব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর চুল সামান্যই সাদা হয়েছিল। কিন্তু আবু বকর ও ওমর (রা) মেন্দী দিয়ে খেযাব করেছেন। রাবী বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবু বকর (রা) নিজ পিতা আবু কোহাফাকে বহন করে নিয়ে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ (স) সামনে রাখেন। তাঁর দাঁড়ি ও মাথার চুল সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ খেযাব দিয়ে দাঁড়ি ও মাথার চুলের রং পরিবর্তন করুন, তবে কাল রং ব্যবহার করবে না।–আহমদ, সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহা-নাসেরুদ্দীন আলবানী, হাদীস নং-৪৯৬।

এ আলোচনায় কাল খেযাবের মাধ্যমে কৃত্রিম যৌবন সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, অন্য খেযাব লাগানো জায়েয আছে। কেউ কেউ বলেছেন, স্ত্রীর সন্তোষের লক্ষে কাল খেযাব ব্যবহার জায়েয। যাই হোক, এ বিষয়ে মতভেদ থাকলেও প্রথম মতটিই বেশী শক্তিশালী।

১৬. যুবক-যুবতীরা জাগো

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল যৌবনের দ্রুত বিদায়ের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলেনঃ "আমার কাছে যৌবনকে এমন মনে হয় যেন আমার আস্তিনের ভেতরে কিছু একটা ছিল, তা ঝরে পড়েছে।" অর্থাৎ যৌবনকাল দ্রুত শেষ হয়ে যায়। তাই এ বয়সে নেক কাজ যতবেশী করা যায় সে জন্য চেষ্টা করতে হবে। এ বয়সের ইবাদাতের বিরাট মূল্য রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "আল্লাহ যুবক ইবাদাতকারী দ্বারা ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করেন এবং বলেন ঃ হে আমার জন্য আপন বাসনা বর্জনকারী যুবক! হে আমার সন্তুষ্টিতে যৌবন অতিবাহিতকারী যুবক ! তুমি আমার কাছে ফেরেশতাদের মতই।"[২]

যুবকের ঈমানের আন্তরিক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সাহাবী হযরত হানজালা উসাইয়েদীর নিম্নের মন্তব্যে। তিনি বলেন ঃ "হযরত আবু বকর আমার সাথে

১. উলুমিদ্দিন–ইমাম গাজ্জালী (র)।
২. এহইয়াউল উলুম-রোযা অধ্যায়, ইমাম গাজ্জালী।

সাক্ষাত করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে হানজালা ! কেমন আছ ? আমি বললাম, হানজালা মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ ; তুমি এটা কি বলছ ? হানজালা বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে অবস্থান করলে তিনি আমাদেরকে জান্নাত এবং জাহান্নাম সম্পর্কে ওয়াজ করেন। যেন আমরা সচক্ষে তা দেখছি। কিন্তু যখন আমরা তাঁর কাছ থেকে চলে আসি, তখন স্ত্রী, সন্তান ও সম্পদের মধ্যে ডুবে যাই এবং বহু কিছু ভুলে যাই। আবু বকর বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমরাও তো এরূপ অবস্থার শিকার। তখন আমি এবং আবু বকর সিদ্দিক রওনা করলাম এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে প্রবেশ করলাম। আমি বললাম ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! হানজালা মুনাফিক হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ এটা কি ? আমি বললাম ঃ আমরা আপনার কাছে থাকা অবস্থায় আপনি আমাদেরকে জাহান্নাম ও জান্নাত সম্পর্কে শিক্ষা দেন যেন আমরা তা সচক্ষে দেখছি। কিন্তু আমরা যখন আপনার কাছ থেকে বের হয়ে যাই এবং স্ত্রী, সন্তান ও সম্পদের মধ্যে ডুবে যাই, তখন বহু কিছু ভুলে যাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার শপথ করে বলছি ঃ তোমরা আমার কাছে যে অবস্থায় থাক যদি সর্বদা সে অবস্থায় কিংবা জিকররত থাক, তাহলে ফেরেশতারা তোমাদের বিছানা ও রাস্তায় তোমাদের সাথে হাত মিলাতো। কিন্তু হে হানজালা ! এক ঘণ্টা ইবাদাতে এবং এক ঘণ্টা দুনিয়াবী কাজে ব্যয় কর।"–মুসলিম-জিকর অধ্যায়

এমন যুবকরাই আল্লাহর রাস্তায় জামে শাহাদাত পানে আগ্রহী হয়। জান্নাতের দুর্নিবার আকর্ষণ সেখানে পৌঁছার পথে একমাত্র বাধা-জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়ে আর কালক্ষেপণ করতে রাজী নয়। কেননা, আল্লাহ জান্নাতে শহীদানের জন্য রেখেছেন বর্ণনাতীত আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ।

খায়সুমা (রা)-এর তরুণ ছেলে সা'দ বদর যুদ্ধে শহীদ হওয়ায় খায়সুমার অন্তরে বিরাট ঈর্ষা। তিনি আফসোস করে বলেন ঃ বদর যুদ্ধ আমাকে অতিক্রম করে চলে গেছে। তিনি বলেন ঃ আমি তাতে অংশগ্রহণের জন্য এতই আগ্রহী ছিলাম যে, নিজ ছেলের সাথে নামের লটারী দেয়ায় তার নামই লটারীতে উঠেছে। সে যুদ্ধে গিয়ে শরাবে শাহাদাত পান করে ধন্য হয়েছে। আমি গতরাতে স্বপ্নে আমার ছেলেকে জান্নাতের ফলের বাগানে সর্বোত্তম আকৃতিতে বেড়াতে দেখলাম। সে বলল ঃ আল্লাহ যা ওয়াদা করেছেন, তা আমি পেয়েছি। খায়সুমা (রা) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমি নিজ ছেলের সাথে জান্নাতে যেতে খুবই আগ্রহী। আমার বয়স বেশী হয়েছে এবং হাড় দুর্বল হয়ে গেছে। আমি আল্লাহর সাক্ষাতের জন্য একান্তভাবে লালায়িত। দোয়া করুন, আল্লাহ

যেন আমাকে শাহাদাত দেন। তিনি তাঁর জন্য দোয়া করেন। ফলে, খায়সুমা ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন।

আমর বিন জামুহ ছিলেন লেংড়া। তাঁর চার যুবক ছেলে সর্বদা মহানবীর সাথে যুদ্ধে যেতেন। আমর ওহুদ যুদ্ধে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ছেলেরা বলেন, আল্লাহ আপনাকে ওজরগ্রস্ত করায় জেহাদ আপনার জন্য ফরজ নয়। আপনি ঘরে থাকুন। আমরাই আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট। আমর নৈরাশ হয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আসেন এবং বলেন ঃ আমার ছেলেরা লেংড়া হওয়ার অজুহাতে আমাকে জেহাদে যেতে নিষেধ করে। আমার লেংড়ামী কি জান্নাতের অন্তরায় ? তিনি বলেন, আল্লাহ তোমার জেহাদ মাফ করেছেন। তারপর তিনি ছেলেদেরকে বলেন, তার জন্য তোমরা কেন শাহাদাতের দোয়া কর না ? সম্ভবত আল্লাহ তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দেবেন। আমর ওহুদ যুদ্ধে গিয়ে শহীদ হয়ে যান। আমাদের পূর্বসূরীদের কাছে শাহাদাত ছিল প্রাপ্য নগদ বিষয়।

[১]যুবক-যুবতীরা হবে শৌর্য-বীর্যে মু'মিন ও জ্ঞানে-গুণে বলিষ্ঠ কর্মবীর। তারা হবে যমীনে আল্লাহর খলীফা। এ প্রত্যয় জাগ্রত হলে, তারা পারে জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে দুর্বার গতিতে, দুর্দম শক্তিতে সামনে নবসৃষ্টির নেশায় এগিয়ে যেতে, তাওহীদের শারাবান তাহুরা পানে মত্ত মাতোয়ারা একদল যুবক-যুবতীই তৈরি করেছিলেন মহানবী (স)। টগবগে তাজা-তরুণ প্রাণকেই তাওহীদের বৈপ্লবিক আহ্বান উদ্দীপিত করে তুলেছিল, সবার আগে।

প্রিয়নবী (স) বলেছেন ঃ 'আমি সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছি যুবকদের দ্বারা, আর বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি বৃদ্ধদের দ্বারা। আবু জাহল এবং আবু লাহাবরা ছিল বৃদ্ধ। মহানবী যুবকদেরকে এমন মধুর শরাবই পান করালেন, যুবক বেলাল ও যুবক আম্মার বিন ইয়াসির ভুলে গেলেন যালেমের রক্ত চক্ষু। অবলীলাক্রমে অগ্রাহ্য করলেন বাবলা কাঁটার আঘাত, আগুনের সেঁকা ও চাবুকের কষাঘাত। ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত দেহ এবং ওষ্ঠাগত প্রাণ। তবু কণ্ঠে তাওহীদের বজ্র নির্ঘোষ। এমন আরো অনেক যুবক উন্মত্ত পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন তাওহীদের দৃপ্ত মশালের বুকে। বাপের আদর, মায়ের স্নেহ, প্রেয়সীর প্রেম, সন্তানের মায়া, সমাজপতিদের রক্তচক্ষু, যালেমের অত্যাচার-নিপীড়ন, যুলুমের ষ্টীম রোলার কোনো কিছুই তাদের সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারল না। আবু বকর, ওমর ও হামজা এবং আয়েশা ও যয়নব সহ আরো অনেক তেজদীপ্ত তরুণ তাজা প্রাণ শরীক হলেন মহানবী (স)-এর বিপ্লবী কাফেলায়।

---

১. দৈনিক ইনকিলাবের উপসম্পাদকীয় সংক্ষেপিত-২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪।

এ যুবক-যুবতীরা সকল উদ্যম, নিষ্ঠা, কর্মশক্তি, সহায়-সম্পদ, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত নিবেদন করলেন ইসলামের সেবায়। এ যুবকদেরই এক বিরাট অংশ ঈমান রক্ষার্থে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে হিজরত করলেন লোহিত সাগরের ওপারে হাবশায় বর্তমান ইথিওপিয়ায়। পরে আল্লাহর নির্দেশে এ সকল যুবকের সকলেই মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করে ছুটে গেলেন মদীনার পবিত্র মাটিতে। যুবক হযরত আলী প্রিয়নবী (স)-এর হিজরতের রাতে যে শয্যায় হযরতের মৃত্যু অবধারিত হয়েছিল, হযরতকে বিদায় করে সে যম শয্যায় স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে দেহ পেতে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকলেন।

হযরত আবু বকর (রা) সাওর গুহায় প্রবেশ করে পাহাড়ী সাপের আঘাতে মৃত্যুর আশংকা সত্ত্বেও নিজ পা দিয়ে গর্তমুখ বন্ধ করে মানবতার মুক্তির আদর্শের বাহকের জীবন নিরাপদ করলেন।

ইসলামের বীর তরুণ সমাজ প্রতিটি সংকটে ও অভিযানে বুক প্রশস্ত করে এগিয়ে গেছেন, জীবন তুচ্ছ করে মহাবিপদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ইসলামী বাহিনীর মধ্যে যুবকের সংখ্যাই বেশী ছিল। অধিকাংশ সেনাপতি ছিলেন যুবক। খালেদ বিন ওয়ালিদ, তারেক বিন যিয়াদ, মূসা বিন নুসাইর, ওকবা বিন নাফে, সালাহ উদ্দীন আইউবী, মোহাম্মদ বিন কাসেম, বখতিয়ার খিলজী এবং তাদের সাথী মোজাহিদীনের অধিকাংশই টাটকা তাজা প্রাণ বীর যুবক। তারা উষর মরুর ধূসর দিগন্ত অতিক্রম করেছেন। নদী-সাগর পেরিয়েছেন। পাহাড় ডিঙ্গিয়েছেন। উত্তাল সাগরের বক্ষে বিজয় অভিযান চালিয়েছেন। অতি স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তারা আটলান্টিকের বেলাভূমি থেকে ভারত পর্যন্ত, আরব সাগরের সৈকত থেকে চীনের মহাপ্রাচীর পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ বিজয় করে ইসলামের বিজয় ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছেন। শৌর্য-বীর্যে বিস্ময়াভূত করেছেন বিশ্ববাসীকে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে অর্জন করেছেন বিরাট সাফল্য। সাহিত্য ও দর্শন সর্বক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছেন নয়া যমানা। জন্ম দিয়েছেন এক নতুন সভ্যতার। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির ভিত তারাই রচনা করেছেন। তারাই জন্ম দিয়েছেন রসায়ন, পদার্থ, জ্যামিতি, ভূগোল, চিকিৎসা শাস্ত্র, গণিত শাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্রের। বিশ্বব্যাপী ইসলামের এ মহান বিজয়ে যুব সমাজের অবদান অবিস্মরণীয়।

আজ ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চার অভাবে মুসলিম যুবকরা নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে উন্নতির একমাত্র মাপকাঠি মনে করে। ইসলামের ম্যাগনেটিক শক্তি দিয়ে তাদেরকে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে।

তরুণকে আসতে হবে ফুলের মত সুন্দর হয়ে, ফলের মত অন্তহীন সম্ভাবনা নিয়ে। বাইরে সে হবে উচ্ছল-লীলা চঞ্চল। কিন্তু ভেতরে সে হবে একজন সংযমী সাধক। সে আসবে প্রাণের প্রাচুর্য নিয়ে, খালি হাতে নয়। দক্ষিণা সমীরণে সে হাসবে, নাচবে, খেলবে বটে কিন্তু বিদায় বেলায় রেখে যাবে তার প্রাণের সমগ্র সঞ্চয়কে এ পুরনো বৃক্ষের কাণ্ডে কাণ্ডে, ডালে ডালে। তরুণের হাতে এমনি করে বর্ষে বর্ষে আসবে পুরাতনের পুষ্টি ও নবজীবনের উল্লাস।

যুবকের বিদ্রোহ হবে সৃষ্টিধর্মী। তার জীবনের লীলা প্রকাশ পাবে পুরাতনকে অস্বীকার করে নয়, সহজভাবে তাকে স্বীকার করে, স্বতন্ত্র হয়ে নয়, তাকেই আশ্রয় করে। সে এত প্রাণ-প্রাচুর্য নিয়ে আসবে, যে প্রাচীনের সমস্ত দৈন্য ও অভাব ঢেকে দিয়েও তার প্রাণ শক্তি যেন অবশিষ্ট থাকে।

—উপসম্পাদকীয় শেষ

ফরাসী শাসক ফ্রাংগ স্পেনের মুসলিম রাষ্ট্রের পতন ঘটাতে চেয়েছিলেন বারবার। সে জন্য তিনি গোয়েন্দা লাগিয়ে রেখেছিলেন। গোয়েন্দারা এসে রিপোর্ট দিল, এখনও মুসলমানরা আল্লাহর কিতাব আঁকড়ে ধরে আছে এবং মসজিদগুলো মুসল্লীতে ভরা। ফরাসী নেতৃবৃন্দ ও রাজনীতিবিদরা বলেন, এখনও আক্রমণের সময় হয়নি। একদিন এক গোয়েন্দা স্পেনে ঢুকে এক মুসলিম বাচ্চাকে কাঁদতে দেখে তার কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করেন। শিশুটি উত্তর দেয়, আমি একবার তীর মেরে দুই পাখী শিকারের ট্রেনিং নিয়েছি। আজকে আমি একবার তীর নিক্ষেপ করে মাত্র একটি পাখী শিকার করেছি। সে জন্য আমার দুঃখ। গোয়েন্দা ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে বলল, এই যদি তাদের শিশুদের অবস্থা হয়, তাদের সাথে যুদ্ধে পারার কোনো কারণই নেই। অপেক্ষার পর অপেক্ষা করতে করতে যেদিন দেখল যে, মুসলমানরা নফসের কামনা-বাসনা এবং গুনাহ ও অন্যায়ের মধ্যে ডুবে গেছে, তখন গোয়েন্দা বলল, হ্যাঁ, এখন তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের সময় এসেছে।[১]

যুবক-যুবতীদের সামনে মহানবীর নিম্নোক্ত হাদীসটিও থাকা দরকার।

হযরত সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ 'শীঘ্রই আমার উম্মতের কাছে এমন একটি সময় আসবে, যখন দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি তাদের দিকে এমনভাবে ধাবিত হবে, যেমন ধাবিত হয় ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্যের পাত্রের দিকে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল ! সেদিন কি আমরা সংখ্যায় খুবই নগণ্য হবো ? তিনি বলেন, না, বরং সেদিন তোমাদের সংখ্যা হবে অনেক। কিন্তু তোমরা হবে বন্যার পানিতে ভেসে আসা খড় কুটোর

১. সাপ্তাহিক দাওয়াহ রিয়াদ—২৮শে রবিউল আউয়াল ১৪১৬ হিঃ।

মত। অবশ্যই আল্লাহ্ সেদিন তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে তোমাদের ভীতি দূর করে দেবেন এবং তোমাদের মনে তাদের ভয় সৃষ্টি করে দেবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমাদের মনে এ দুর্বলতা ও ভীতি সৃষ্টির কারণ কি ? তিনি বলেন ঃ তোমরা দুনিয়াকে ভালবাসবে এবং মৃত্যুকে অপসন্দ করবে।

—আবু দাউদ

মুসলমান হচ্ছে বীরের জাতি। তারা দুনিয়ার দেশে দেশে পরিবর্তন এনেছেন, সংস্কার ও সংশোধন করেছেন বিশ্বাবাসীকে। আজ তাদেরই সংশোধন দরকার সর্বাগ্রে। তারপর বিশ্বমানবতার প্রতি তাদের পয়গাম পৌছাতে হবে। যুব সমাজ জাগ।

কবি যুব শক্তির বিস্ফোরণ এবং অলৌকিক প্রচণ্ডতায় বিশ্বাসী। তাই তিনি যুবকদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

চড়িয়া সিংহ ধরে কেশর
নৌজোয়ান
বাহন তাহার তুফান-ঝড়
নৌজোয়ান
শিরপেতে বলে বজ্র আয়
দৈত্য চর্ম পাদুকা পায়
অগ্নিগিরিরে ধরে নাড়ায়
নৌজোয়ান।

যুবকদেরকেই দিশেহারা জাতির পথ প্রদর্শন করতে হবে এবং সঠিক পথের দিশা দিতে হবে। উদ্দাম-দুর্বার যুবকরাই পারে জাতিকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে। তাই জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেন ঃ

হেলিতেছে তরী, দুলিতেছে জল,
ভুলিতেছে মাঝি পথ
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান
আছে কার হিম্মত ?

যুবকদের ছাড়া কি দুর্গম অভিযানের কল্পনা করা যায় ? দীনের সর্বোচ্চ স্তর বা চূড়া হচ্ছে জিহাদ। যুবক ছাড়া কি শিশু-বৃদ্ধের দ্বারা জিহাদের চিন্তা করা যাবে ? যাদের ধমনীতে যৌবনের উত্তপ্ত রক্ত সঞ্চারিত তারাই কেবল পারে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে। বাঁচলে গাজী, মরলে শহীদ—এটা শুধু যুবকদের জন্যই প্রযোজ্য।

শেষ

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

- ইসলামে মসজিদের ভূমিকা
- ইসলামের চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
- ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয়তা
- ভালো মৃত্যুর উপায়
- ইসলামের দৃষ্টিতে এইড্‌স রোগের উৎস ও প্রতিকার

যে যুবক যুবতীর সাথে
ফেরেশতা হাত মিলায়
এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম